আনসারী স্মরণিকা সিরিজ

সূরা কাহাফ এবং বর্তমান বিশ্ব

এই গ্রন্থটি পবিত্র কুর'আনের সূরা কাহাফের একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যেষণা। কেন এক রহস্যপূর্ণ ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিষ্টান জোট ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে? কেন তারা মুসলমানদের উপর একতরফা ভাবে নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে? কেনই বা তারা ইউরো-ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈলের পক্ষ নিয়ে এক অশুভ কার্যক্রমের পেছনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে? এসকল প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যার সন্ধানে এই গ্রন্থটি রচিত।

মূল: শায়খ ইমরান নযর হোসেন

অনুবাদ: মুহাম্মদ আলমগীর

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

খিযির (আ:) মূসা (আ:)-কে বললেন: "নিশ্চয়ই আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় আপনার বোধগম্য নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কেমন করে? (*যেহেতু আপনি সবকিছুই বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেন, অতএব আপনি শুধু বাহ্যিক জ্ঞানই লাভ করতে পারেন*)।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৬৭-৬৮

যারা দাজ্জালের মত সব বিষয়কে বাইরের চোখ দিয়ে দেখে, তারা খিযিরের মত (অর্থাৎ যারা ভেতর ও বাইরের দুই চোখ দিয়ে দেখে, এমন) ব্যক্তিদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার উপর দাজ্জালের ভয়ঙ্কর আক্রমণ মানুষকে ভেতর থেকে অন্ধ করে দিচ্ছে, অতএব মানুষ যে কোন বিষয়ের বাহ্যিক বিবরণ দেখে প্রতারিত হচ্ছে, ফলে দাজ্জালের রহস্যপূর্ণ মিশনের বাস্তবতাকে বুঝতে পারছে না। কখনো কখনো মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে, এর ফলে তারা যে বিপথে চলে যাচ্ছে সেই সচেতনতাও হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে তারা, ইতিহাস কোন দিকে এগিয়ে চলেছে তা বুঝতে পারে না, অথবা শেষ যামানায় পবিত্রভূমি অর্থাৎ জেরুযালেমের কী ভূমিকা তাও বুঝতে পারে না। কুর'আনের ঘোষণা অনুযায়ী তাদের মর্যাদা গবাদি পশুর মর্যাদার সমান।

আবু দারদা (রা:) বর্ণনা করেন: আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) বলেছেন, "যদি কেউ সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে।"

— সহীহ মুসলিম

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগমনের সময় জীবিত থাকবে, সে যেন সূরা কাহাফের গোড়ার আয়াতগুলি তেলাওত করে।"

— সহীহ মুসলিম

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত তেলাওত করে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে।"

— তিরমিযী

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করেন: রাসূল (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুম্মার দিন (অর্থাৎ পৌত্তলিক জগতের 'শুক্রবারে') সূরা কাহাফের তেলাওত করে সে এক জুম্মা থেকে পরের জুম্মা পর্যন্ত (এই সূরার আলোকে) উদ্দীপিত থাকবে।"

— নাসাঈ, বায়হাকী, হাকিম

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

"সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি তার (অর্থাৎ কুর'আনের) সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।"

— সূরা ফুরক্বান, ২৫:৫২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত:

ইমরান নযর হোসেন
ইমেল: inhosein@hotmail.com
ওয়েব: www.imranhosein.org

প্রকাশক:

মানারাহ পাবলিকেশন
বাড়ী নং ১৯২/এ (৪র্থ তলা)
সড়ক ১, নিউ ডি-ও-এইচ-এস, মহাখালী, ঢাকা ১২০৬
ফোন: ৮৭১১১৩১-২, ৮৮৬১৩৮১, ৮৮৬১৯৪৬

আই এস বি এন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৪৩২৬-০

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ:
মাহির প্রিন্টারস
২২৪/১ সালাম ম্যানশন
ফকিরাপুল ১ম লেন
মতিঝীল, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৭১৯১৮৩৯, ০১৭১৫-৬৯৬৯৮৪, ০১৮২৪-৮৬৮০১২

মূল্য: ১৬০ টাকা

উৎসর্গ

আমার প্রিয় স্ত্রী আয়েশা,
যে ভেতর ও বাইরের দুই চোখ দিয়ে দেখে।
আমি তার জন্য এজগতে বাসস্থান তৈরী করে দিয়েছি।

দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনাঃ
তিনি যেন তার জন্য জান্নাতে বাড়ী
তৈরী করে দেন।
আমীন !

সূচি

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ..... ১

অনুবাদ বৃত্তান্ত ৫

মুখবন্ধ ৭

১ § ভূমিকা ৯

২ § আল-কুর'আন এবং সময় ১৫

৩ § সূরা কাহাফ ও নবী (সাঃ)-এর সুন্নত ৫৫

৪ § সূরা কাহাফ অবতীর্ণ হবার ঐতিহাসিক পটভূমি..... ৬১

৫ § গুহার যুবকদের কাহিনী ৭৩

৬ § এক ধনী ও এক গরীবের রূপক-কাহিনী ৯৩

৭ § মূসা এবং খিযিরের রূপক-কাহিনী ১০৫

৮ § যুলকার্‌নাইনের কাহিনী ১২৫

৯ § সূরা কাহাফঃ শুরুর অংশ..... ১৩৫

১০ § সূরা কাহাফঃ শেষ পর্ব..... ১৪৯

পরিশিষ্ট..... ১৫৭

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত, দার্শনিক এবং সুফী শায়খ মাওলানা ডাঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারীর (১৯১৪-১৯৭৪) সম্মানে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই সিরিজের প্রকাশনা তাঁর ২৫তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৯৭ সালে শুরু হয়েছিল।

মাওলানা আনসারী ছিলেন একজন ইসলামি পন্ডিত, শিক্ষক, এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। তিনি এমন এক সময় গোটা জীবন ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন যখন সমগ্র পৃথিবী মূলত স্রষ্টাবিমুখ হয়ে গিয়েছিল। এই সাধনায় তাঁকে পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তুরের দশক পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামি বক্তৃতা প্রদানের জন্য ভ্রমণ করতে হয়েছিল। তিনি ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর করাচি চলে এসেছিলেন। তাঁর নতুন বাসস্থান থেকে বেরিয়ে তিনি পশ্চিম দিকে রওনা হতেন এবং কয়েক মাস পর পূর্ব দিক থেকে বাড়ি ফিরতেন।

মাওলানা আনসারী ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও ধর্মের উপর উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ইসলামি পন্ডিত ডাঃ মুহাম্মদ ইকবালের কাছ থেকে ইসলামি দর্শন এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ইকবালের পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*। এই গ্রন্থটির ডাকে সাড়া দিয়ে মাওলানা আনসারী *The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society* বইটি লেখেন।

তিনি বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত, সুফী শায়খ এবং সদা-ভ্রমণরত ধর্মপ্রচারক মাওলানা আব্দুল আলীম সিদ্দীকির কাছ থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ অর্জন করেন। তিনি আল্লামা ইকবাল এবং মাওলানা সিদ্দিকী উভয়ের কাছ থেকেই epistemology বা (সুফী) জ্ঞানতত্ত্বের শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর ছাত্রদের কাছে তা হস্তান্তর করেন। সুফী পদ্ধতি ব্যবহার করে যখন 'সত্য'-কে ধারণ করা হয় (অর্থাৎ ইসলামকে মেনে নেয়া হয়), এবং আন্তরিকতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তির সাথে জীবন যাপন করা হয়, তখন 'সত্য' অন্তরে প্রবেশ করে (অর্থাৎ ইসলাম ঈমানে পরিণত হয়)। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্-তা'আলা ঘোষণা করেছেন: "আমার বেহেশত আর আমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাসী বান্দার অন্তর আমাকে ধারণ করতে পারে।" এই হাদীসটি মনের অন্তরে সত্যের গৃহীত হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়।

যখন অন্তরে সত্য প্রবেশ করে, তখন এক স্বর্গীয় আলোও অন্তরে প্রবেশ করে। আর সেই আলো আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিশ্বাসীরা

বাহ্যিক দৃশ্য পেরিয়ে অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে। এই অবস্থায় বিশ্বাসীরা ভেতর ও বাইরের উভয় চোখ দিয়ে দেখতে পায়। পক্ষান্তরে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল শুধু বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখে। যে বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য জিহাদ চালিয়ে যায়, তার ঈমান ইহসানের পর্যায়ে উন্নিত হয়। এটিই তাসাউফ নামে পরিচিত।

একমাত্র এই আলো দ্বারাই প্রকৃত বিশ্বাসী আল্লাহ্‌র সদা-প্রকাশমান নিদর্শনগুলিকে বুঝতে পারবে। শুধু এভাবেই বর্তমান বিশ্বকে সঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। যারা বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতাকে বুঝতে পারে, তারা জানে যে আমরা এখন ফেৎনার যুগে বসবাস করছি। এটাই হচ্ছে সেই শেষ যুগ অথবা কিয়ামতের সময়, যখন প্রথমে ইসলামের বিজয়ের সাথে ইতিহাসের ইতি টানা হবে, এবং তারপরে এই পৃথিবীকে নতুন এক জগতে রূপান্তরিত করা হবে।

মাওলানা আনসারী করাচিতে আলীমিয়া ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠার জন্য তার জীবনের শেষ দশটি বছর (১৯৬৪-১৯৭৪) আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি সেখানে ইসলামি পন্ডিতদের একটি নতুন প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যারা এই রহস্যপূর্ণ আধুনিক যুগকে বুঝতে পারবে, এবং এর দানবীয় চ্যালেঞ্জের যথাযথ মোকাবিলা করতে পারবে। তার চেষ্টার ফলস্বরূপ আলীমিয়া ইনসটিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ, করাচি, পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এলেন ডাঃ ওয়াফি মুহাম্মদ, ইমরান এন হোসেন (ত্রিনিদাদ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ); ডাঃ আবুল ফজল মুহসীন ইব্রাহীম, ডাঃ আব্বাস ক্বাসীম (মরহুম), মুহাম্মদ আলী খান এবং আরো অনেকে (দক্ষিণ আফ্রিকা); সিদ্দিক আহমেদ নাসির, রউফ জামান এবং মুহাম্মদ শাফি (গায়ানা, দক্ষিণ আমেরিকা); আলী মোস্তফা (সুরিনাম, দক্ষিণ আমেরিকা); বশীর আহমদ কীনো (মরিশাস); এবং আরো অনেকে।

এপর্যন্ত আনসারী মেমোরিয়াল সিরিজে নিম্নোক্ত বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে, যার সবকটিই মওলানার একজন বিশেষ ছাত্রের লেখা।

১। পবিত্র কুর'আনে জেরুযালেম - ইসলামের দৃষ্টিতে জেরুযালেমের শেষ অধ্যায়।
২। সূরা আল-কাহাফ - অনুবাদ এবং আধুনিক ভাষ্য।
৩। সূরা আল-কাহাফ এবং বর্তমান বিশ্ব।
৪। ইব্রাহীম (আ:)-এর ধর্ম এবং ইসরাঈল রাষ্ট্র - কুর'আনের দৃষ্টিতে।
৫। আধুনিক যুগে শেষ দিনের নিদর্শন সমূহ।
৬। ইসলামে সুদ নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব।
৭। কুর'আন ও সুন্নায় সুদের নিষেধাজ্ঞা।
৮। ইসলামে স্বপ্ন - সত্য এবং অন্তরে প্রবেশের জানালা।
৯। খিলাফত, হিজায এবং সৌদি, ওহাবী জাতি-রাষ্ট্র।
১০। রমযানের রোযার তাৎপর্য এবং ইসরা ও মি'রাজ।
১১। এক জামাত - এক আমীর: ফেৎনার যুগে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগঠন।

যে বৃক্ষ মাওলানা আনসারী রোপন করেছিলেন, এই সিরিজটিতে তারই কিছুটা প্রতিফলন রয়েছে, অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতাকে বুঝতে পারা, সেটাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা, এবং তার নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জকে রুখে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি।

এই সিরিজে আরো তিনটি বই যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি *সূরা কাহাফ* সম্পর্কে, যা প্রস্তাবিত চারটি বইয়ের অংশ হিসাবে লেখা হয়েছে। বাকি দু'টি বই হবে *দাজ্জাল* এবং *ইয়াজুজ ও মাজুজ* সম্পর্কে। সিরিজের তৃতীয় নতুন বইটি *আধুনিক যুগে শেষ দিনের নিদর্শন* সম্পর্কে লেখা হয়েছে, যা এসব বিষয়ে লেখা কিছু প্রবন্ধের সমষ্টি।

মাওলানা আনসারীর জীবন, কর্ম এবং চিন্তা ভাবনার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া সিরিজটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেকারণে, তাঁর জীবনী রচনার কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

মাওলানা আনসারী পাকিস্তানের আলীমিয়া ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা ক'রে এবং আলীমিয়া মেমোরিয়াল সিরিজ প্রকাশ ক'রে তাঁর নিজের শিক্ষাগুরু মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আলীম সিদ্দিকীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। আনসারী মেমোরিয়াল সিরিজটি সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করার একটি বিনীত প্রচেষ্টা।

অনুবাদ বৃত্তান্ত

শায়খ ইমরান হোসেনের বেশ কয়েকটি বই ইতোমধ্যেই বাংলায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি বইয়ের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। তাঁর লেখাগুলি ধারাবাহিক ভাবে পড়লে মনে হয় যেন তিনি মুসলিম বিশ্বের মূল সমস্যাগুলির diagnosis বা রোগনির্ণয় করতে করতে ২০০২ সালে *পবিত্র কুর'আনে জেরুযালেমে* এসে থমকে দাঁড়ালেন! নিঃসন্দেহে এক সাড়া জাগানো বই। মনে হলো, তিনি যা খুঁজছিলেন তা শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেছেন। কিন্তু না, তিনি অনেকটা মূসা (আ:)-এর মতই বসে থাকলেন না; বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকার (أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا) সংকল্প নিয়ে বেরুলেন খিযির (আ:)-এর খোঁজে। আবারও রূপক অর্থে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে মুসলিম জাহানের রোগ নিরাময়ের prescription বা ব্যবস্থাপত্র পেয়ে গেলেন; নাম দিলেন *সূরা কাহাফ এবং বর্তমান বিশ্ব*।

পড়লে মনে হয়, বই দু'টি তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের দু'টি মাইলফলক। প্রথমটিতে তিনি দেখতে পেলেন অতীত-ইতিহাস, অর্থাৎ, যে সকল ঘটনা আজকের বর্তমানকে জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনাগুলির বিবরণ তিনি কুর'আন ও ইতিহাসের পাতা থেকে সংগ্রহ করে আমাদের সুবিধার জন্যে তুলে ধরলেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি দেখতে পেলেন ভবিষ্য-ইতিহাস। আবারও সেই কুর'আন ও হাদীসের আলোকে ঘটনাগুলিকে আয়নার মত স্বচ্ছ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন, এবং অত্যন্ত গুরুত্ব ও দক্ষতার সাথে বর্তমান এই সংকট সময়ে সেগুলির মুখামুখি হবার জন্য কী প্রস্তুতি নিতে হবে তার বর্ণনা দিলেন।

ইতোমধ্যেই সারা পৃথিবী, কি মুসলিম কি অমুসলিম, তাঁর লেখা ও বক্তৃতার এক বিশাল সম্ভারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছে। এটাও বলতে হয় যে, আজকের information boom বা তথ্য ছড়াছড়ির যুগে যেসকল শীর্ষস্থানীয় খ্যাতি-সম্পন্ন বক্তা, লেখক এবং পথপ্রদর্শক আন্তর্জাতিক মঞ্চে কর্মরত রয়েছেন, অর্থাৎ যাঁরা আমাদের নজরে রয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা পঞ্চাশ জনেরও বেশী হবে [দ্রষ্টব্য হালাল টিউব]। এছাড়া গোটা মুসলিম জাহানে শত-সহস্র মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য ইসলামি প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য সম্মানিত গুরু ও পণ্ডিত রয়েছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান-কল্পে তাঁরাও মূল্যবান অবদান রেখে চলেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও, একটি বিষয় মোটামুটি ভাবে এঁদের সকলের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। এনাদের মধ্যে কাউকেই ইতিহাসের একটি সমন্বিত চিত্র তুলে ধরতে দেখি না; সে ইতিহাস অতীতের হোক আর ভবিষ্যতের। বলা বাহুল্য, আমাদের সামনে ইতিহাসের এই সমন্বিত চিত্র না থাকলে 'বর্তমান'-কে সামগ্রিক জাগরণের উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত করা সম্ভব হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় যে, শায়খ ইমরান হোসেন এক অনন্যসাধারণ কাণ্ডারি হিসেবে সবার চেয়ে আলাদা স্থান করে নিয়েছেন।

শায়খ ইমরান হোসেনের সাথে আমার পরিচয় ছাত্র জীবন থেকে। করাচিতে মাওলানা ফজলুর রহমান আনসারী (রা:) যখন এক বিশেষ আবাসিক ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করলেন, তখন আমরাই হলাম সেখানকার প্রথম ছাত্রদের অন্যতম। বিকেলে চলত ইসলামি শিক্ষা, আর দিনের বেলা আমরা যেতাম করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে, মূলত দর্শন এবং বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞানের শিক্ষা অর্জন করার জন্যে। এবিষয়ে এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ হবে যে, মাওলানার ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে শায়খ ইমরান হোসেনের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য সকল তুলনার ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ, তাঁর সম্পর্কে যতই বলা হোক কমই বলা হবে।

শায়খ ইমরান হোসেনের লেখাগুলি বাংলায় অনুবাদ করার শত প্রয়োজন সত্ত্বেও আমি কখনো একাজে সাহস করিনি। তবে যখনই কেউ তাঁর কোন বইয়ের অনুবাদ করেছে, তিনি আমাকে সেটি এক নজর দেখে নিতে বলেছেন। যারা *সূরা কাহাফ এবং বর্তমান বিশ্ব* বইটির গুরুত্ব আনুধাবন করার পর, এটি অনুবাদ করার আবেগময় উদ্যোগ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন লন্ডন-নিবাসী মুহাম্মদ ইমরান হোসেন এবং দ্বীনুজ্জামান চৌধুরী, আর ঢাকা-নিবাসী সৈয়দ জাভেদ আহমদ।

প্রথমোক্ত দুজনেই শায়খ ইমরান হোসেনের অন্যান্য বই এবং অসংখ্য অডিও-ভিডিওর অনুবাদের জন্যে এক বিশাল দল গড়ে তুলেছেন, এবং এই কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। *সূরা কাহাফ এবং বর্তমান বিশ্ব* বইটির মুদ্রণের যাবতীয় খরচ মুহাম্মদ ইমরান হোসেন একাই বহন করছেন। এই অনুবাদে বহু খুঁটিনাটি সংশোধন ও পরিমার্জনে দ্বীনুজ্জামান চৌধুরী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অন্যান্য বহু দায়িত্ব পালনের সাথে এই বইটি প্রকাশনার কাজে সৈয়দ জাভেদ আহমদের অবদান অতুলনীয়। সবশেষে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয় সিডনী-নিবাসী মুহাম্মদ মহিববুল আলমের বিশেষ সহযোগিতার কথা। বাংলা ভাষায় তাঁর দক্ষতার উপর আমি সব সময় নির্ভর করেছি। এনাদের সকলের সাথে কাজ করে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। এনাদের আন্তরিকতায় আমি গর্বিত।

এই কাজে কুর'আনের মূল আরবী নিয়েছি Tanzil.net ওয়েবসাইট থেকে। কুর'আনের আয়াতগুলির অর্থের জন্যে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও প্রফেসার মুজীবুর রহমানের অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি। বাইবেলের উদ্ধৃতিগুলি নিয়েছি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ৩৯০ নিউ এস্কাটন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *কিতাবুল মোকাদ্দাস* গ্রন্থ হতে।

এই কাজে যাবতীয় ভুলভ্রান্তির জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী রইলাম। অতএব, পাঠকের কাছে অনুরোধ রইল, যদি কোন সংশোধন করার বা পরামর্শ দেবার প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে সেটা প্রকাশকের মাধ্যমে আমার কাছে নিশ্চয় পাঠাবেন। বিনীত,

মুহাম্মদ আলমগীর
সিডনী, অস্ট্রেলীয়া
ডিসেম্বর, ২০১১

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যার দয়ায় *সূরা কাহাফ এবং বর্তমান বিশ্ব* প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই সামান্য কাজের ফল যেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেন, আর তাদেরকে কুর'আনের এবং বিশেষ করে এই সূরার আরও কাছে আসতে সাহায্য করেন। তিনি যেন প্রত্যেক জুম্মার দিন সবাইকে এটি পাঠ করার সৌভাগ্য দান করেন যার মাধ্যমে তারা দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। এই সূরার অর্থ যেন তাদের স্মৃতিতে সতেজ হতে থাকে, এবং বিশেষ করে এই সূরার প্রতি তাদের বোধ শক্তি যেন আরো গভীর হতে থাকে। *আমীন!*

যখন ইসলামের উপর আক্রমণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে, যখন ভণ্ড ইউরো-ইহুদি ইসরাঈলী রাষ্ট্র পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্রে অধিষ্ঠিত হতে চলেছে, এবং যখন ভুয়া মাসীহ দাজ্জাল জেরুযালেম থেকে গোটা বিশ্বকে শাসন করতে যাচ্ছে, এবং ঘোষণা দিতে যাচ্ছে যে সে-ই সত্য মাসীহ, তখন আমার ভয় হয় যে অনেকেই কুর'আন-নির্ভর বই লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। তাই আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি এবং এই প্রার্থনায় আমার পাঠকদেরও আহ্বান জানাচ্ছি, যেন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বইগুলিকে রক্ষা করেন (যেমন সূরা কাহাফের উপর লেখা চারটি বইয়ের সমষ্টি) যেগুলি কুর'আনের ভাষ্য অনুযায়ী স্রষ্টা-বিমুখ আধুনিক যুগের কুচক্রীদের মুখোশ উন্মোচন করবে, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। *আমীন!*

ইহুদি-খ্রিষ্টান জোটকে সাথে নিয়ে রহস্যপূর্ণ ইউরোপীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা ইসরাঈল রাষ্ট্রের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। যদি মনে হয় যে এই বইটির বক্তব্যে একান্তই কোন মূল্য রয়েছে, তাহলে আশা করি এটি এই লেখকের চেয়েও যোগ্যতর মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করবে, এবং তারা পবিত্র কুর'আনের এই সূরাকে ব্যবহার ক'রে বর্তমান বিশ্বের আসল স্বরূপকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এই চারটি খন্ডের প্রথম খন্ডটিতে সূরা কাহাফের *মূল আরবীসহ শাব্দিক অনুবাদ এবং আধুনিক ভাষ্য* দেয়া হয়েছিল। প্রথম খন্ডটি *সূরা কাহাফ এবং বর্তমান বিশ্ব* গ্রন্থটির সহযোগী হিসাবে প্রায় একই সাথে প্রকাশিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি যেন আমি *দাজ্জাল* এবং *ইয়াজুজ-মাজুজের* উপর কুর'আন ও হাদীসের (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) ভাষ্যের আধুনিক ব্যাখ্যাসহ আরো কতকগুলি খন্ড লিখতে পারি।

সূরা কাহাফের উপর লেখা প্রথম দু'টি পুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন আফ্রিকার মালাউই-র অধিবাসী আবুবকর হোসেন জাখুরা এবং তাঁর স্ত্রী রাবেয়া,

মালয়েশিয়ার আব্দুল মজিদ কাদের সুলতান এবং ফাতিমা আব্দুল্লাহ, এবং সিঙ্গাপুরের হাজ্জা হানিফা বিনতে উমর খান সূরাটি এবং হাজ্জা মরিয়ম বিনতে ফকির মুহাম্মদ।

আল্লাহ্ এদের উপর দয়া করুন। *আমীন!*

ইমরান নযর হোসেন
কুয়ালা লাম্পুর, মালয়শিয়া
জুন ২০০৭

১ § ভূমিকা

এই বইটিতে আধুনিক বিশ্বের *বাস্তবতাকে* ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায় কুর'আনের সূরা কাহাফের বিশ্লেষণ দেয়া রয়েছে। যারা কুর'আনকে এক আল্লাহ্‌র বাণী বলে মেনে নিয়েছেন, এই বইটি তাদের সুবিধার জন্য লেখা হয়েছে। যারা কুর'আনকে ঐশ্বরিক বাণী বলে স্বীকার করেন না, তাদেরকে ১৪০০ বছর পূর্বে দেয়া চ্যালেঞ্জ মোতাবেক পবিত্র কুর'আনের মত একটি সূরা লেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা কুর'আনের ঐ ঘোষণা দিয়ে শুরু করতে পারি যে, এই গ্রন্থটির প্রাথমিক কাজ হলো *সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া*।

. . . وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ . . .

" . . . আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ (অর্থাৎ কুর'আন) নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করে।"

— সূরা নাহ্‌ল, ১৬:৮৯

মুসলমানেরা প্রায়শই ভুলে যায় যে, কুর'আনে দেয়া দিকনির্দেশনা ছাড়া কেউই আধুনিক বিশ্বের রহস্যাবলীকে ভেদ করতে পারেনা। এই সহজ সরল সত্য সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্ব অর্থনীতি, আন্তজার্তিক মুদ্রা সমাচার ইত্যাদি। কুর'আনকে বাদ দিলে এটাও বুঝা যাবে না যে, যারা আধুনিক ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিষ্টান বিশ্বব্যবস্থাকে সহায়তা করছে কিভাবে তাদের প্রাচুর্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে; আর যারা ইউরোপীয় ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রতিহত করছে, কিভাবে তাদের দারিদ্র্যতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একই কথা আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনকে বুঝার ব্যাপারেও সত্য। আরও, এই কথাটি ইহুদিদের পবিত্রভূমিতে ফেরত আসা, (যেখানে আল্লাহ্‌-তা'আলা ২০০০ বছর আগে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন), এবং সেখানে ইসরাঈল রাষ্ট্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও সত্য। সর্বশেষে কুর'আন এটাও পরিষ্কার করে দেয়: কিভাবে শীঘ্রই ইসরাঈল পৃথিবীর নিয়ন্তা-রাষ্ট্রে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে।

যে ব্যক্তি বর্তমান বিশ্বের *বাস্তবতাকে* অনুধাবন করতে পারেনি, সে নিজেই সঠিকভাবে হেদায়েত-প্রাপ্ত কিনা সেব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না, এবং সেকারণে অন্যদের জন্য সঠিক পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের বড় বিপর্যয় এটাই যে তাদের অধিকাংশ নেতারা *বাস্তবকে* বুঝতে পারছেন না, সেহেতু তারা নিজেরাই প্রচন্ড ভাবে বিপথে পরিচালিত হচ্ছেন। অপর দিকে যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা এবং যাদের উপর সত্যজ্ঞানের আশির্বাদ রয়েছে, তাদের উপর শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে, অথবা তাদেরকে এমনভাবে দুর্নাম করা হচ্ছে

যে তারা পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করতে পারছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের হেদায়েত বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। যেসকল ইসলামি পন্ডিত আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে কুর'আন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করেন, তাদের জন্য রয়েছে আরেক সমস্যা — বাহ্যিকতার উপর নির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গির পণ্ডিতগণ তাদেরকে বর্জন করেন, এমনকি নানাভাবে প্রশ্নজর্জরিত করেন।

এই বইটি তাদেরকে আশ্বস্ত করে, যারা বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতাকে বুঝতে পেরেছে; যারা কুর'আনের, বিশেষ করে সূরা কাহাফের, ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করে এবং অনুধাবন করে; এবং এটা স্বীকার করে যে, বর্তমান যুগের ভয়ঙ্কর পরীক্ষা থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক জুম্মার দিনে সূরা কাহাফের তেলাওত অবশ্যই করতে হবে।

এই বইটিতে যুক্তি দেখান হয়েছে যে, ঐতিহ্যগত ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (অর্থাৎ দারুল উলুমগুলিতে) যে ধর্মীয়জ্ঞান শেখানো হয়, তা বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার ক্ষেত্রে কুর'আনে দেয়া ব্যাখ্যাকে বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামের চিরসত্যগুলি তুলে ধরা ছাড়াও ইসলামি পন্ডিতদের কিছু 'কৌশলগত জ্ঞানের' প্রয়োজন রয়েছে। এই কৌশলগত জ্ঞানকে কুর'আন *আল-বসিরাহ্* (আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারই সাথে সংযুক্ত করতে হবে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আসা আধুনিক চিন্তাভাবনার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা। এর কারণ, এই পাশ্চাত্য সভ্যতাই হলো ইসলামের জীবন-বিধানের প্রতি সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

আমাদের যুক্তি এই যে, ইসলামি পন্ডিতগণ বাহ্যিক জগতের জ্ঞানের পাশাপাশি যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন না হন, এবং যদি আল্লাহ্‌র নূরের মাধ্যমে দেখতে না পান, তাহলে এই পৃথিবী তাদেরকে প্রতারিত করবে। এর কারণ এই যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক দৃশ্যপট প্রায়শই বাস্তব সত্য থেকে ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ যেসকল পথ জাহান্নামের রাস্তাকে সুগম করে দেয়, প্রতারণার সাথে সেগুলিকে জান্নাতের রাস্তা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। যেমন: শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে জান্নাতের পথকে জাহান্নাম হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এ বিষয়গুলি মহানবী (সা:) আগেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন।

ইসলামের গোটা ইতিহাসে দেখা যায় যে, অন্য সবার তুলনায় সুফী শায়েখদের চলার পথেই অধিক আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, সেকারণে তারাই অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাকে অন্য মানুষের চেয়ে বেশী বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তা সত্যেও আমরা এমনই এক সময়ে বাস করছি যখন, উদাহরণস্বরূপ, আমার স্বনামধন্য শিক্ষক ডাঃ মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (১৯১৪-১৯৭৪) এবং তাঁর গুরু মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আলীম সিদ্দিকীর (১৮৯২-১৯৫৪) মত অসাধারণ আলোকবর্তিকা এবং শিক্ষকেরা ভয়ঙ্কর আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

এই লেখাটি আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এমনও মানুষ রয়েছে যাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন; তারা কখনও কুর'আনকে বুঝতে পারে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

"তার চাইতে অধিক জালেম কে যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বুঝানোর পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্ম সমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপরে পর্দা বিস্তার করে দিয়েছি যেন তারা কুর'আনকে বুঝতে না পারে, এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎ পথের দিকে দাওয়াত দেন তবে তারা কখনই সৎ পথের দিকে আসবে না।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৫৭

বর্তমান যুগের 'বাস্তবতা' সম্পর্কে কুর'আনের ব্যাখ্যা কী?

সূরা কাহাফকে বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পৃথিবীর শেষ যুগ (অর্থাৎ কেয়ামতের যুগ) এসে গেছে; এবং এযুগের প্রধান নায়করা হচ্ছে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজ। এই শেষ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রতারণা, স্রষ্টাবিমুখতা, নিপীড়ন এবং নজিরবিহীন আতঙ্ক ও বিপদ।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, অবশ্য আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, এই শেষ যুগের সূচনা হয়েছিল সেই সময় যখন মহান আল্লাহ্-তা'আলা বিশ্বাসীদের জন্য নামাযের দিক (কিবলা) জেরুযালেম থেকে মক্কার দিকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। জেরুযালেমে কিবলা ছিল মসজিদে আকসা, যেটি সুলায়মান (আ:) নির্মাণ করেছিলেন, এবং যেখানে একটি পবিত্র প্রস্তরখণ্ড রাখা ছিল। আর মক্কার কিবলা ছিল মসজিদুল হারাম বা কা'বা, যা ইব্রাহীম (আ:) তৈরী করেছিলেন। এখানেও একটি পবিত্র প্রস্তরখণ্ড রাখা ছিল। কিবলা পরিবর্তনের এই ব্যাপারটি ঘটেছিল মুহাম্মদ (সা:) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সতের মাস পর।

কিবলা পরিবর্তনের পরিণতিতে, ইব্রাহীম (আ:)-এর অনুসারীদের মাঝে রাসুলুল্লাহ্ (সা:)-এর নেতৃত্বে, পৃথিবী এক নতুন সম্প্রদায় বা উম্মতের জন্ম দেখতে পেল। এই নতুন মুসলিম সমাজ ইব্রাহীম (আ:)-এর সত্যধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে ইহুদিদের জায়গা নিয়ে নিল। রাসুলুল্লাহ্ (সা:)-কে এক আল্লাহ্র সত্য-নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করায়, ইসরাঈলী ধর্মীয় গোষ্ঠী (বনী ইসরাঈল) তাদের যতটুকু গ্রহণযোগ্যতা অবশিষ্ট ছিল, তাও হারাল।

ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ্ (সা:)-কে আরবদের নবী হিসেবে মানতে রাজি ছিল। কিন্তু তাঁকে 'বিশ্ব-প্রভুর বাছাই করা সম্প্রদায়' অর্থাৎ ইহুদিদের কাছে পাঠানো হয়েছে, এটা তারা

হজম করতে পারে নি। তাদের জেদ ছিল যে ইহুদিদের কাছে নবী আসলে তাকে ইহুদিই হতে হবে।

রাসুলুল্লাহ্ (সা:) এবং তাঁর কাছে পাঠানো কুর'আন ইহুদিদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার পরই আল্লাহ্-তা'আলা ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজদিগকে পৃথিবীতে মুক্ত করে দিলেন। অতএব শেষ নবী (সা:)-এর জীবদ্দশাতেই শেষ যুগ শুরু হয়ে যায়। এক হাদীসে দুই আঙ্গুল একত্রে তুলে তিনি নিজেই এই ঘোষণা দিয়েছিলেন:

সাহ্ল বিন সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত: আমি আল্লাহ্র নবী (সা:)-কে তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি একত্রে তুলে বলতে শুনলাম, "আমার আগমন ও শেষ সময় এই দুই আঙ্গুলের মত। এক বিশাল বিপর্যয় সর্বত্র ছেয়ে যাবে। আমি আর শেষ দিন এই দু'টির মত।"

— সহীহ বুখারী

অতএব বলা যায়, দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়ে সঠিক অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া শেষ যুগের চ্যালেঞ্জকে কেউ বুঝতে পারবে না। এই বইয়ে দেখানো হয়েছে যে, এই বিষয়গুলির চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে সূরা কাহাফের ভেতরে। আধুনিক যুগের অশুভ দিকগুলি যেভাবে একটার পর একটা সামনে আসছে সেগুলির ব্যাখ্যা রয়েছে এই সূরার মধ্যে।

সূরা কাহাফ অধ্যয়ন করে অপর যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি সেটা এই: ঈমানদারদের জন্য বিশ্বাসকে ধরে রাখার একমাত স স্রষ্টাবিমুখ নগরগুলি ত্যাগ করে দূরবর্তী গ্রামে গিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। খ্যাতনামা তুর্কি মনীষী বদিউজ্জামান সাঈদ নুর্সীরও এই ধারণা ছিল। চীনা কমিউনিস্ট নেতা মাওশেতুঙ্গ তাঁর বিপ্লবের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। অনুরূপভাবে আমরাও একই কৌশলের প্রস্তাব করছি যে, প্রত্যন্ত মুসলিম গ্রামে ছোট ছোট আকারে ইসলামের ঘাঁটি গড়ে তোলা হোক যেখানে মুসলিম নারী-শিশুরা নিপীড়ন, স্রষ্টাবিমুখতা, অশ্লিলতা ও অনাচার থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

আধুনিক যুগের মুসলিম পণ্ডিতবর্গ এর উল্টোটাই চিন্তা করেন। তারা মনে করেন যে মুসলমানদের উচিত সকল কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া, এবং সেই সাথে মানবসমাজকে সঠিকপথের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য বর্তমান যুগের শহরগুলিতে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

সূরা কাহাফ, ইহুদি জাতি ও শেষ যুগ

ইহুদি জাতি ও শেষ যুগের সাথে সূরা কাহাফের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কটি বুঝতে পারার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইহুদি ও খ্রিস্টানের আগ্রহ থাকা উচিত হবে।

মদীনার ইহুদি র‍্যাবাই বা ধর্মযাজকগণ মহানবী (সা:)-কে পরীক্ষা করার জন্য তার সামনে তিনটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিল। কথা ছিল যে, তিনি যদি প্রশ্ন তিনটির সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে এটা বুঝা যাবে যে তিনি সত্যই একজন নবী। এই বইয়ে প্রশ্ন তিনটি ও তাদের উত্তরসহ ঐ ঘটনাটির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রশ্নগুলি ও কুর'আনে দেয়া উত্তরগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, রাসূল (সা:) নবী ছিলেন কিনা সেটি পরীক্ষা করা প্রশ্নগুলির আসল উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর পেছনে লুকানো ছিল অন্য এক গভীর উদ্দেশ্য।

আসলে, এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত চতুরতার সাথে করা হয়েছিল এটা জানার জন্য যে রাসূল (সা:) শেষ দিনের বৃহত্তম নিদর্শন, অর্থাৎ দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে জানতেন কিনা।

সূরা কাহাফ শুরু হয়েছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, যার লক্ষ্যবস্তু হলো দাজ্জাল, যদিও তা কথায় প্রকাশ হয়নি। এই বইয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সূরাটিকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা যা বিশ্বাসীদেরকে আরও গভীরভাবে দাজ্জাল সম্পর্কে জানতে, এবং তাদের নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে দাজ্জালের ফেৎনা হতে বাঁচার উপায় বের করতে, সাহায্যে করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সূরাটি ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়টি উপস্থাপন করে।

সূরা কাহাফের মধ্যে চারটি কাহিনী রয়েছে, যা কখনো বর্ণনার আকারে আবার কখনো রূপকের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম গল্পটি কয়েকজন যুবকের গুহায় অবস্থানকে নিয়ে, যা দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে আরও গভীর করে দেয়। দ্বিতীয় গল্পটি একজন ধনী ব্যক্তি এবং একজন গরীব ব্যাক্তিকে নিয়ে। সেটিতেও মূলত দাজ্জালের কারসাজির সন্ধান পাওয়া যায়। তৃতীয়টি মূসা (আ:) ও খিযির (আ:)-কে নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী। এটিও দাজ্জালের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। সর্বশেষ চতুর্থ গল্পে এক মহান পর্যটকের কথা রয়েছে, যার মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ে সূরা কাহাফের এই চারটি গল্প এবং রূপক কাহিনীগুলির আলোচনা করা হয়েছে।

এই সুন্দর গল্প ও রূপক কাহিনীগুলি আলোচনা করার আগে আমাদের উচিত হবে 'সময়' সম্পর্কে কুর'আনে প্রদত্ত ধারণার পর্যালোচনা করা। এই বিষয়টি না বুঝা পর্যন্ত আমরা কুর'আন ও হাদীসে দেয়া শেষ যুগের নিদর্শনগুলি বুঝতে পারব না। একই সাথে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আধিপত্য সম্পর্কে বুঝতে পারব না। সেই কারণে এই বইটি শুরু করা হয়েছে *আল-কুর'আন ও সময়*, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে।

আমি যখন পাকিস্তানের করাচিতে আলীমিয়াহ ইনষ্টিটিউট অফ ইসলামিক স্টাডিজে মাওলানা ডাঃ আনসারীর ছাত্র ছিলাম (১৯৬৪-১৯৭১), তখন বুঝতে পারিনি কেন তিনি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'বহুমাত্রিক সময়'-কে এত গুরুত্ব দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করতেন। হালে 'সময়' ও শেষ দিনের নির্দেশনাবলীর মধ্যে একটি বিস্ময়কর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরে আমি বুঝতে পেরেছি আমাদের শিক্ষক যা শেখাতে চেয়েছিলেন সেটি কত অসাধারণ প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল।

দুঃখের বিষয়, কোন দারুল উলুম অথবা উচ্চ ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টি আর পড়ানো হয় না। বর্তমান সময়ে ইসলামের আধ্যাত্মিক উৎস তথা তাসাউফ বা ইহসানের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধই এর অন্যতম কারণ। উপরন্তু, সুফীদের মধ্যে অনেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এই উৎসের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন। আমাদের লেখা *ইকবাল, সুফী জ্ঞানতত্ত্ব এবং ইতিহাসের শেষ অধ্যায়* নামক রচনায় আমরা এই বিস্ময়কর হতবুদ্ধিতার কিছু প্রমাণ সরবরাহ করেছি। রচনাটি *বর্তমান যুগে কেয়ামতের নির্দেশনাবলী* বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

২ § আল-কুর'আন এবং সময়

সময় সম্পর্কে যে ঐশ্বরিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এবং যেভাবে এই রচনায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেটা থেকে বুঝা যায় যে, সময়ের আসল প্রকৃতি বেশ জটিল এবং বহুমাত্রিক। সময়, যুগের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন মাত্রায় প্রবাহিত হয়। একমাত্র বিশ্বাসী ও পুণ্যবানেরাই নূর দ্বারা পরিচালিত, এবং তারাই সময়ের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে। কুর'আনের প্রসিদ্ধ সূরা আসরে সময়কে লক্ষ্য করে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সর্তক করে বলেছেন যে, বিশ্বাসীরা ব্যতীত সকল মানুষ এই বিষয়ে অজ্ঞ থাকবে। অবশ্যই যারা সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে চলবে, তারা তাদের গন্তব্যস্থলে ঠিকমত পৌঁছবে এবং মিথ্যার উপর সত্যের জয়কে দেখতে পাবে। (সূরা আসর, ১০৩:১-৩)।

সূরা কাহাফের যুবকেরা ৩০০ বছর অতিক্রম করার পর চিন্তা করল তারা সর্বমোট এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত করেছে, কারণ অনন্তকালের সাথে যোগাযোগ ঘটলে সময়ের হিসাব রাখা কঠিন হয়ে যায়। সবই তখন এই মুহূর্ত বা এক্ষণ মনে হয়। যে 'এখানে এবং এক্ষণ'-এর বেড়াজাল অতিক্রম করতে পেরেছে, সে সময়হীনতাকে অনুভব করতে পারবে। একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক ভালবাসা এবং সত্যধর্মের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি সময়ের বাঁধন থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে।

এই রচনায় যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, দাজ্জালের বিষয়টি বুঝতে হলে মনকে 'এখানে এবং এক্ষণ'-এর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সময়ের বিভিন্ন জগতকে ভেদ করতে হবে।

যারা মহান আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তারা ব্যতীত বাকি সকলের চেতনা সময়ের একটি মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যারা অবিশ্বাসী, কেয়ামতের দিন তাদের চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদের দৃষ্টি প্রখর হয়ে যাবে। তারা তখন অন্য সব কিছুর সাথে সময়েরও আসল বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারবে।

কুর'আনে সেই সকল মানুষের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে একদিন বাস্তব জগত দেখাবার জন্য সময়ের কারাগার হতে বের করা হবে। যদিও তারা এই পৃথিবীতে দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিল, তথাপি কিয়মতের দিন এক নতুন জগতে পুনরুত্থানের পর সময়ের নতুন মাত্রা সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাবে। (দেখুন সূরা ইব্রাহীম, ১৪:৪৮)। সেদিন তারা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের দিনগুলিকে 'এক দিন বা তার কিছু অংশ' হিসেবে বর্ণনা করবে:

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

(তাদেরকে বলা হবে) "তোমরা এটা (বিচার দিবস) সম্পর্কে অমনোযোগী ছিলে, এখন আমরা তোমাদের চোখের সামনের পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব আজ তোমাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে!" *(যে বিষয়গুলি সর্বপ্রথমে তাদের সেই তীক্ষ্ণ নজরে পড়বে, সময়ের বাস্তবতা হবে তার মধ্যে অন্যতম)।*

— সূরা ক্বাফ, ৫০:২২

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾
قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

(যারা হতাশ হবে তাদেরকে) তিনি বলবেন: "তোমরা বছরের গণনায় পৃথিবীতে কদিন ছিলে?" তারা বলবে: "আমরা একদিন বা তার কিছু অংশ অবস্থান করেছি; বরং আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যারা হিসাব জানে।" তিনি বলবেন: "তোমরা সেখানে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে!"

— সূরা মুমিনুন, ২৩:১১২-১১৪

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّـهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ
فَهَـٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَـٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে তারা এক ঘন্টার বেশি অবস্থান করেনি। এমনিভাবে তারা ধোঁকার মধ্যে থাকত। যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে: "আমরা আল্লাহ্‌র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এটাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।"

— সূরা রূম, ৩০:৫৫-৫৬

কুর'আনের এই আয়াতগুলি বিশ্বাস ও সময়ের সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলে, অর্থাৎ যারা বিশ্বাসী তারাই সময়ের বাস্তবতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যার উপলব্ধি যত গভীর তার বিশ্বাস ততটুকু খাঁটি।

মৌলবাদী ইসলাম এবং সময়ের ধারণা

মৌলবাদ আদতে একটি ইউরোপীয় ঘটনা। এটি এমন এক অদ্ভুত ধারণা যা ধর্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি হতে বঞ্চিত। এটি জ্ঞান অর্জনকে পাশ্চাত্য একচোখা জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে; সেই সাথে অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বৈধতাকে অস্বীকার করে। এই জ্ঞানতত্ত্বটি ইসলামি চিন্তধারাকে প্রভাবিত করার ফলে জন্ম নেয় ইসলামি মৌলবাদ, যা এর ফলস্বরূপ ইসলামের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকে পরিত্যাগ করে। এই অদ্ভুত চিন্তাধারা একদিকে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের পক্ষে কাজ করছে,

আর অপরদিকে ইসলামের সেই সুফীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে যারা ধর্মীয় নির্দেশনাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার যোগ্যতা রাখেন।

রাসূল (সা:) ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

" . . . আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করে দেবার পর সে পৃথিবীতে ৪০ দিন থাকবে, যার এক দিন হবে এক বছরের মত, এক দিন হবে এক মাসের মত, এক দিন হবে এক সপ্তাহের মত, এবং বাকি দিনগুলি হবে তোমাদের দিনের মত।"

— আন-নাউওয়াস বিন সাম'আন (রা:) হতে বর্ণিত; সহীহ মুসলিম

দূর্ভাগ্যক্রমে ইসলামের কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আধুনিক ইউরো-খ্রিষ্টান ও ইউরো-ইহুদি জ্ঞান দ্বারা গভীরভাবে প্রতারিত হয়ে ইসলামের মধ্যে মৌলবাদী ধারণার সুত্রপাত করেছেন। এর ফলে তারা কেবলমাত্র বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখেন, তাই সময় সম্পর্কে যে ধারণা পবিত্র গ্রন্থে দেয়া রয়েছে তার আক্ষরিক অর্থের বাইরে কিছুই জানতে চান না, এবং বুঝ সামর্থ রাখেন না। তারা মনে করেন, আমরা যদি ভাল করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে, এমনও স্থান রয়েছে, যেখানকার এক দিন আমাদের এক বছরের মত; আরেক স্থান এমন পাওয়া যাবে যেখানকার এক দিন আমাদের এক মাসের মত; আরো এক স্থান এমন পাওয়া যাবে যেখানকার এক দিন আমাদের এক সপ্তাহের মত; এমনি ভাবে খুঁজতে থাকলে আমরা সেই স্থান পেয়ে যাব যেখানে দাজ্জালকে তার মুক্তির পরে দেখা যাবে।

দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে খুব বেশী হলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যেতে পারি যেখানে একটানা ছয় মাস রাত ও ছয় মাস দিন পাওয়া যায়। কিন্তু এই জ্ঞান উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

শত শত বছর ধরে সুফী শায়খরা ধর্মীয় জীবনের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করতে পেরেছেন, এবং খিযির (আ:)-এর মত ভেতর ও বাইরের দুই চোখ দিয়ে দেখেছেন। (ইমাম গাজ্জালি তাদেরই একজন)। ঈমানের বা বিশ্বাসের গভীরতার কারণে তারা সময়ের বাস্তবতাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খিযির (আ:)-এর পথ অনুসরণ করে আমরা ধর্মীয় নির্দেশনাবলীর আধ্যাত্মিক অর্থ উদ্‌ঘাটন করার জন্য সুফী জ্ঞানতত্ত্বের প্রয়োগ করেছি। ফলশ্রুতিতে আমরা মেরু অঞ্চলসহ পৃথিবীর যে কোন স্থানে দাজ্জালের উপস্থিতির খোঁজ করাকে অবাস্তব বলে খারিজ করে দিয়েছি। আমরা মনে করি, একমাত্র পবিত্রভূমি জেরুযালেমে বিশ্বাসীরা দাজ্জালকে দেখতে পাবে। অবশ্যই সেটা হবে তার দুনিয়াব্যাপী কুকর্মের শেষ পর্যায়ে, যখন তার 'দিন' আমাদের দিনের মত হবে, অর্থাৎ সে তখন সময়ের সেই মাত্রায় প্রবেশ করবে যে মাত্রায় আমরা বাস করছি।

আমরা জানি পবিত্রভূমির উপর স্বর্গীয় আশির্বাদ রয়েছে, সম্ভবত এই কারণে সেখানে সময়ের এক মাত্রা থেকে আর এক মাত্রায় প্রবেশের ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে। এই একই কারণে রাসুলুল্লাহ (সা:)-কে আকাশমন্ডলে নিয়ে যাবার পথে প্রথমে জেরুযালেমে নিয়ে যাওয়া হয়। (আমাদের পৃথিবী আর এর বস্তুসমূহ তৈরী করার পর আল্লাহ্-তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য স্থান ও কালের আরও সাতটি স্তর, অর্থাৎ সাতটি আকাশমন্ডল তৈরী করেন। দেখুন সূরা বাকারাহ, ২:২৯)।

দাজ্জালের মিশন সাফল্যের সাথে সম্পূর্ণ হবার পরই তাকে জেরুযালেমে দেখা যাবে, অর্থাৎ তখন পৃথিবীতে তার ৪০ দিনের বিস্ময়কর অবস্থান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দাজ্জালের দেখা দেবার আগেই যারা পৃথিবীতে তার কার্যকলাপকে বুঝতে পারছেন না তারা বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত দানকারী হিসেবে কোন কাজে আসতে পারেন না, কারণ তারা নিজেরাই প্রতারিত হয়ে রয়েছেন।

তবুও দাজ্জালকে খোঁজ করার ব্যাপারে আমরা মৌলবাদী ইসলামি জ্ঞানীদের অধিকারকে অস্বীকার করছি না। (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী) তারা সেই গাধার অপেক্ষা করছেন, দাজ্জাল যার পিঠে চড়ে বেড়াবে: "এটা হবে মেঘের মত গতি-সম্পন্ন এবং তার কান দু'টি থাকবে ছড়ানো।" আর, "সে (দাজ্জাল) যখন সাগরে পা রাখবে, তখন পানি তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছাবে।" আমরা হাদীসগুলিকে বুঝার জন্য সুফীতত্ত্ব ব্যবহার করেছি। আমাদের দৃঢ় ধারণা, গাধাকে বর্তমান যুগের বিমান বা উড়োজাহাজের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এবং 'দাজ্জালের সাগরে পা দেয়া'-র মধ্যে নিহিত রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাগরের গভীরতাকে ভেদ করার ভবিষ্যদ্‌বাণী।

আহমাদী সম্প্রদায় ও সময়ের ধারণা

পাঠক এই অধ্যায়ের মধ্যে এই বিশেষ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। এর উত্তর বা ব্যাখ্যা হলো এই যে, আহমাদিয়া আন্দোলন আসলে প্রটেস্ট্যান্ট (বিচ্ছিন্নবাদী) ইসলামের সৃষ্টি, ফলশ্রুতিতে তারা ইসলামে দেয়া সময়ের বিষয়টি বুঝতে অক্ষম। আহমাদিয়া আন্দোলনের সদস্যরা ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল ও সত্য-মাসীহ মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ:)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে তাদের প্রতিষ্ঠাতার বিভ্রান্তিকর শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

আহমাদিয়া সমপ্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ দাবি করেছে যে সত্য-মাসীহ মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ:)-এর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণীটি তার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়েছে। যদি তার দাবি সত্য হতো (বলা বাহুল্য, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা) তাহলে রাসূল (সা:)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী তার (মির্জা) জীবদ্দশায় সে দাজ্জালকে হত্যা করত। আবার, এর অর্থ এটাও হতো যে, দাজ্জালের পৃথিবীতে ৪০ দিন

সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তারপর সে নিহত হয়েছিল আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার হাতে, যে নিজেকে মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ:)-এর স্থলে অভিষিক্ত বলে দাবী করেছিল।

মির্জা গোলাম আহমদ এই বই লেখার প্রায় এক শত বছর আগেই মারা গেছে। কিন্তু, দাজ্জালের পার্থিব জীবনের ৪০ দিন কিভাবে এই ভুয়া ভারতীয় মাসীহের হাতে শেষ হলো, সে অথবা তার বিপথগামী অনুসারীরা তার কোনো ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত করেনি।

সময় এবং আকাশমন্ডলির বিভিন্ন স্থান ও কালের বিষয়টি ভেদ করার অক্ষমতার কারণে আহমাদিয়া সম্প্রদায় রাসূল (সা:)-এর অলৌকিক জেরুযালেম সফর ও ঊর্ধ্ব আকাশে মিরাজে গমনকে কেবলমাত্র এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হিসেবে চালিয়ে দেয়। তিনি যে সশরীরে সময় এবং স্থানের বিভিন্ন মাত্রা অতিক্রম করেছিলেন, সেটাকে তারা গ্রাহ্য করে না। ঠিক তেমনি ঈসা (আ:)-এর আকাশে উঠিয়ে নেওয়াকে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনকে স্বীকার করে না। বরং তাদের ধারণা যে, ক্রুশবিদ্ধের চেষ্টার পরও তিনি বেঁচে ছিলেন, এবং কাশ্মিরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা তাঁর তথাকথিত কবরও আবিষ্কার করেছে।

মির্জা গোলাম আহমেদ ছিলেন বহু মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের মধ্যে একজন, যাদের রহস্যপূর্ণ আবির্ভাবের কথা রাসূল (সা:) ইতোপূর্বেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন। মির্জা ও তার ভ্রান্ত শিক্ষা অধ্যয়ন করে আমরা সেই মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারি যা দাজ্জালের পদাংক চিনতে সাহায্য করে। এখানেই নিহিত রয়েছে এই অধ্যায়ে আহমাদিয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব।

ইকবাল ও আসাদ

সময়ের সঠিক ধারণার সাথে জড়িত বিষয় দু'টি নিয়ে কেবলমাত্র মৌলবাদী ইসলাম ও আহমদিয়ারাই বিপথগামী হন নাই। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ডাঃ মুহাম্মদ ইকবাল এবং মুহাম্মদ আসাদ (রা:)-কেও বিষয় দু'টি জ্ঞানতত্ত্বের বিবেচনায় চ্যালেঞ্জ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইকবাল একটি ভ্রান্ত উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম হলো একটি অবস্থার নাম, কোন জায়গার নাম নয়।

"জান্নাত ও জাহান্নাম হলো বিশেষ অবস্থা, কোন স্থান নয়। কুর'আনে যা বলা হয়েছে তা হলো এগুলির আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহ্যিক বর্ণনা। কুর'আনের ভাষায় জাহান্নাম হলো সেই আগুন যা আল্লাহ্-তা'আলা হৃদয়ের উপরে চাপিয়ে দেন, যা মানুষ হিসেবে ব্যর্থতার কষ্টের অনুভূতি। আর জান্নাত হলো ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ের আনন্দ।"

— Iqbal: Reconstruction of Religious Thought in Islam
Oxford University Press, London. 1934 p.116

অপরদিকে আসাদের ধারণা হলো ঈসা (আ:) ইন্তেকাল করেছেন, এবং তিনি আর ফেরত আসবেন না। তাই এই ভয়ংকর ভুল ধারণাটি তিনি তাঁর লেখা কুর'আনের বিখ্যাত অনুবাদ ও ভাষ্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। (দেখুন তার রচিত কুর'আনের অনুবাদ ও ভাষ্য; সূরা মায়েদা ৫:১১৭, এবং সূরা আলে ইমরান ৩:৫৫)।

বস্তুত, ইকবাল এবং আসাদ, উভয়ই সময়ের বাস্তবতাকে সঠিক ভাবে বুঝতে না পেরে বিরাট ধরণের ভুল করেছেন।

পরিচিত 'সময়'-এর ওপারে

প্রকৃত পক্ষে মহাশূন্য বা 'স্থান' ও মহাকাল বা 'সময়' উভয়ই বহুমাত্রিক। জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ স্থানের নাম, কেবল মনের অবস্থা নয়। সময় ও স্থানের ভিন্ন এক মাত্রায় এগুলির অবস্থান। আমরা যেখানে বেঁচে আছি বা বসবাস করছি, সময় ও শূন্যের গতিশীলতার প্রভাবেই তার সৃষ্টি। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আমরা সময়কে এমন ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো যার পর সন্দেহবাদীরা তাদের চিন্তাধারাকে সংশোধন করতে চাইবেন।

মহান আল্লাহ্-তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আর আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। এখানে 'দিন' বলতে আমরা যা জানি, আক্ষরিক অর্থে তা বুঝানো হয়নি, কারণ আমাদের সুপরিচিত 'দিন' শুরু হয়েছিল আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী এই দু'টি সৃষ্টি করার পর।

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

"বলুন, তোমরা কি সেই সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি কাউকে তার সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।"

— সূরা হা-মীম সেজদাহ, ৪১:৯

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ
مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনিই কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে? আল্লাহ্ই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা করো না।"

— সূরা ইউনুস, ১০:৩

আমরা সময় বলতে যা বুঝি, তারও অধিক অর্থে সেটিকে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা রাসূল (সা:)-এর এই হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়:

"আবু যার (রা:) হতে বর্ণিত: আমি রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞাস করলাম, প্রথম মসজিদ কোন্‌টি যা পৃথিবীর বুকে তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম (মক্কা শরীফ)। আমি আবার জিজ্ঞাস করলাম তারপর কোন্‌টি তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন মসজিদুল আকসা (জেরুযালেমে অবস্থিত)। আমি পুনরায় জিজ্ঞাস করলাম, মসজিদ দু'টি তৈরী করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কী ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন যে, তুমি যেখানেই থাকো না কেন নামাযের সময় হলে নামায আদায় করবে, আর এটাই হলো সর্বোত্তম কাজ।"

— সহীহ বুখারী

যদি আমরা এই সময়কে আক্ষরিক অর্থে চল্লিশ বছর ধরে নেই, তাহলে হাদীসটি পরিষ্কারভাবে ভুল। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে রাসূল (সা:) কথাটি প্রচলিত বারো চান্দ্র মাসের এক বছর হিসাবে উল্লেখ করেন নাই। যখন তিনি এই হাদীসে চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন, এবং যখন তিনি দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসে এক দিনকে এক বছর বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি সেই বছরকে আমাদের পরিচিত বছরের সাথে তুলনা করেন নাই।

ঐতিহাসিক ভাবে হাজার বছরের বেশী সময়কে যদি চল্লিশ বছর বলা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি এখানে বছর বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

সময়ের ধারণাকে যদি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে দাজ্জালের আয়ু মাত্র চল্লিশ দিন হবে অথবা দুই মসজিদ নির্মাণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র চল্লিশ বছর ছিল, এই কথাগুলি আমরা কখনই বুঝতে পারব না। সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে চন্দ্র ও সূর্যের আবর্ত, তথা দিন ও রাতের পরিক্রমাকে দেখে। যারা পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। অবশ্য quantum physics এক্ষেত্রে কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। ঠিক তেমনি দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসগুলিতেও প্রতীকের সাহায্যে ভাবের রূপায়ণ করা হয়েছে; এগুলির আক্ষরিক ব্যাখ্যা সঠিক হবে না। আসলে সুফী জ্ঞানতত্ত্বের মাধ্যমেই দাজ্জালের বিষয়টি উন্মোচন করা সম্ভব ।

আমরা আক্ষরিকভাবে 'আমাদের দিনের মত একটি দিন' কথাটি বুঝতে পারি। এই ধরনের 'দিন' একটি রাত ও পরবর্তী দিন নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ এক সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্ত। দাজ্জাল যখন আমাদের সময়ের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করবে তখন তার 'দিনগুলি হবে আমাদের দিনের মত', অর্থাৎ সেই দিনগুলি হবে পৃথিবীতে তার জীবনের শেষ অধ্যায়। এটা একেবারে পরিষ্কার! যে আমাদের 'সময়'-এর মাত্রায় থাকবে, সে অবশ্যই আমাদের 'স্থান'-এর মাত্রাতেও থাকবে। এই দু'টির সমন্বয়ে যা ঘটে, সেগুলিই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবেচনায় যা আমাদের পরিচিত সময়ে ঘটেছে, তা অবশ্যই আমাদের পরিচিত স্থানেই ঘটেছে। ঠিক তেমনি, দাজ্জাল তার শেষ জীবনে যখন

আমাদের সময় ও স্থানের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করবে তখন আমরা তাকে জেরুযালেমে দেখতে পাব।

এখন প্রশ্ন হলো, দাজ্জাল পৃথিবীর কোথায় থাকবে যখন তার 'একদিন এক বছরের সমান' হবে, তারপর 'এক দিন এক মাসের সমান' হবে, এবং সব শেষে 'এক দিন এক সপ্তাহের সমান' হবে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো: বছরের সমান দিনটি, মাসের সমান দিনটি এবং সব শেষে সপ্তাহের সমান দিনটি আমাদের পরিচিত সময়ের হিসাবে কত দীর্ঘ সময় হবে? এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

আল-গায়ব — অদেখা জ্ঞানাতীত পৃথিবী

ধর্ম সর্বদাই অদৃশ্য পৃথিবীর অস্তিত্বকে সমর্থন করেছে, যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণের আওতার বাইরে। বিশ্বাসীদেরকে সর্বদাই এই অদেখা পৃথিবীকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে।

যখন দাজ্জাল আমাদের দিন হতে ভিন্ন দিনে থাকবে, তখন আমাদের পক্ষে তাকে দেখা সম্ভব হবে না (যদিও সে এই পৃথিবীতেই অবস্থান করবে), কারণ সে তখন গায়বের জগতে অবস্থান করবে। একই কারণে ফেরেশতা ও জ্বিন পৃথিবীতে বর্তমান থাকা সত্যেও মানুষ তাদেরকে দেখতে পায়না। কুর'আনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের (দুই ঘাড়ে) দুই জন ফেরেশতা রয়েছেন:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

"অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। দুজন সম্মানিত (আমলনামার) লেখক। তারা জানে যা তোমরা কর।"

— সূরা ইনফিতার, ৮২:১০-১২

আমাদেরকে আরো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, একজন খারাপ জ্বিন (অর্থাৎ শয়তান) সেই সকল মানুষের সাথে অবস্থান করে যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে সরে যায়, আমি তার জন্য এক শয়তান (অর্থাৎ এক অবিশ্বাসী জ্বিন) নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার ঘনিষ্ট সঙ্গী।"

— সূরা যুখরুফ, ৪৩:৩৬

যদিও আমরা এই সমস্ত ফেরেশতা এবং জ্বিনদের দেখতে পাইনা যারা আমাদের চতুর্পার্শ্বে রয়েছে, তথাপি ঈমানদারগণ তাদের উপস্থিতিকে বিশ্বাস করে। এটাতেই প্রমাণ

পাওয়া যায় যে, সময় ও স্থানের যে জগতে আমরা বাস করছি, সেখানেই পাশাপাশি অবস্থান করছে আরও অন্যান্য জগত যাদের সময় ও স্থানের মাত্রা আমাদের থেকে ভিন্ন।

আমরা অবশ্যই সময় ও স্থানের এমন মাত্রাকে বিশ্বাস করি যা সাধারণ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে। উপরন্তু, আমাদের কাছে কিছু অখন্ডনীয় প্রমাণ রয়েছে যে একজন ফেরেশতা আমাদের মাত্রার মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করতে পারে, যেন আমরা তাকে চোখে দেখতে পারি। জিব্রাইল (আ:) দ্বারা কয়েক বারই এটা প্রমাণিত হয়েছে। এখানে তারই একটি বর্ণনা দেয়া হলো:

আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্তাব (রা:) বর্ণনা করেন: আমার পিতা ওমর বিন খাত্তাব (রা:) আমাকে বললেন, একদা আমরা সকলে মসজিদে বসা অবস্থায় ছিলাম এমন সময় একজন ব্যক্তি উপস্থিত হলো। তার পরনে ছিল ধবধবে সাদা পোশাক এবং তার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তার মধ্যে ভ্রমনের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেহই তাকে চিনতে পারলো না। অবশেষে তিনি রাসূল (সা:)-এর কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি হাঁটু গেড়ে ওনার সামনে বসলেন এবং তার হাতের তালু ওনার দুই উরুর উপর রাখলেন এবং একের পর এক (মোট পাঁচটি) প্রশ্ন করলেন। . . . (হাদীস বর্ণনাকারী ওমর বিন খাত্তাব (রা:)) বললেন: যখন প্রশ্নকারী চলে গেলেন আমি বেশ কিছু সময় রাসূল (সা:)-এর নিকট বসে রইলাম। তখন তিনি (সা:) আমাকে জিজ্ঞাস করলেন: হে ওমর, তুমি কি এই প্রশ্নকারীকে চিন? আমি বললাম: আল্লাহ্ ও তার রাসুলই ভাল জানেন। তিনি (সা:) প্রতিউত্তরে বললেন: তিনি হলেন জিব্রাইল (আ:), তোমাদেরকে ধর্মীয় কিছু বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

— সহীহ মুসলিম

ইতিহাসের এই বিস্ময়কর ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সময় ও স্থানের যে মাত্রায় মানুষ বাস করে, সেখানে মানুষের আকৃতি ধারণ ক'রে একজন ফেরেশতা প্রবেশ করেছিলেন, অর্থাৎ তখন তিনি দৃশ্যমান এবং স্পর্শনীয় ছিলেন।

অনুরূপ ভাবে একজন জ্বিনও মানুষের আকৃতি ধারণ করতে পারে এবং মানুষের সময়ে ও বাস্তব দুনিয়ায় দৃশ্যমান হতে পারে। এবিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো কুরাইশদের এক সমাবেশে একজন বৃদ্ধ আরবের বেশে ইবলিসের আগমন, যেখানে তারা রাসূল (সা:) কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কর্মপন্থা তৈরী করছিল।

"আলখেল্লা পরা একজন বৃদ্ধ শায়খের বেশে শয়তান (ইবলিস) মজলিসের দরজায় সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। যখন তাকে জিজ্ঞাস করা হলো, আপনি কে? উত্তরে সে বলল: আমি একজন শায়খ, আমি এসেছি তোমাদের আলোচনা শুনতে, আর সম্ভবত আমার মতামত বা উপদেশ তোমাদের কাছে অপছন্দ হবে না। পরে সে ভেতরে প্রবেশ করল।"

— ইবনে ইসহাক, সীরাত রাসুলুল্লাহ (সা:)

অনুবাদ Alfred Guillaume, Oxford University Press ১৯৫৫, পৃ:২২১

এখন কী আমরা নির্ভরযোগ্য উৎস ব্যবহার করে বলতে পারি যে আমাদের পরিচিত মাত্রা ছাড়াও সময়ের আরও মাত্রা আছে? আমরা কি 'এক দিন এক বছরের সমান' কথাটির ব্যাখ্যা দিতে পারি?

যেহেতু কুর'আন নিজেকে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দানকারী হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে (সূরা নাহল, ১৬:৮৯), সেহেতু এদ্বারা মহানবী (সা:)-এর যেসকল বিবৃতি সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়, সেগুলিরও ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। অতএব, আমাদের এই রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো হাদীসে বর্ণিত দাজ্জালের চল্লিশ দিনের বিষয়টি কুর'আনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা।

আমরা যখন ছিলাম না তখনও 'সময়' ছিল

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে যখন মানবজাতির অস্তিত্ব ছিল না তখনও 'সময়' ছিল। 'সময়'-এর এক বিশেষ মূহুর্তে ঐশ্বরিক করুণায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়, অতএব 'সময়' মানবজাতির পূর্বেই অবস্থিত ছিল। ইসলাম আরো শিক্ষা দেয় যে, একটা সময় আসবে যখন আল্লাহ্‌র সত্তা বাদে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা রহমান, ৫৫:২৬-২৭)। এখানে বুঝা গেল যে, মানুষ জাতির অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবার পরও সময়ের অস্তিত্ব থাকবে। এবিষয়ে নিম্নের আয়াতটিকে বিবেচনা করা যায়:

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

"মানুষের উপর অন্তহীন মহাকালের এমন ক্ষণ কী অতিবাহিত হয়নি যখন তার (অর্থাৎ মানুষের) কোন উল্লেখ ছিল না?"

— সূরা দাহ্‌র, ৭৬:১

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, শুরুতে মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাকে সময়ের এমন এক মাত্রায় জান্নাতে রাখা হয়েছিল, যা আমাদের বর্তমান বয়স বৃদ্ধিকারী 'জৈবিক সময়' হতে ভিন্ন। পরে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার ফলে তাকে সময়ের সেই মাত্রা থেকে বের করে অস্থায়ী ভাবে বর্তমান মাত্রায় পাঠানো হয়েছে, যেখানে আমরা এখন বাস করছি।

এর তাৎপর্য হলো এই যে, মানুষের বাস্তবতা সময়ের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু সময়ের বাস্তবতা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে সময়ের বাস্তবতা কি? মহান আল্লাহ্ এর উত্তরে বলেছেন যে, তিনিই সময়:

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন, "আদম সন্তান দাহ্‌র বা সময়কে গালি দেয়। আমি নিজেই দাহ্‌র বা সময়। আমারই হাতে রয়েছে দিন ও রাত্রি।"

— সহীহ বুখারী

পবিত্র 'সময়' এবং আধুনিক স্রষ্টাবিমুখ যুগঃ

সত্য ধর্ম ইসলামে নির্দেশিত *সময়* ও *জীবনের* মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্ককে সকল উপায়ে ধ্বংস করাই হচ্ছে আধুনিক স্রষ্টাবিমুখ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে *সময়ের* উপলব্ধি বা পরিমাপের ক্ষমতাকে বিকৃত করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই স্রষ্টাবিমুখ যুগ সময়ের প্রাকৃতিক ও *পবিত্র* ধারণাকে এক বিশেষ ধর্মনিরেপক্ষ ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে চায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আধুনিক স্রষ্টাবিমুখ ইউরো-খ্রিষ্টান ও ইউরো-ইহুদি যুগে, জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বছরের বার মাসের নাম, এবং রবিবার হতে শনিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাত দিনের নাম, পৌত্তলিক ইউরোপের দেব-দেবীদের নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। এটি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। তবুও এটি আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদদের নজরে পড়েনি।

ঠিক তেমনি নিত্যদিনের স্বাভাবিক অতুলনীয় বৈচিত্রপূর্ণ সূর্যাস্তের সাথে দিন শেষ হয় না। বরং সেটি শেষ হয় মধ্যরাতে, এবং পরের দিনটি শুরু হয় এক অর্থহীন এবং সম্পূর্ণ অবাস্তব মুহূর্তে যখন বেশির ভাগ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে।

আরও দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির নিয়মে অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে সূর্যাস্তের পর সরু নতুন চাঁদের আবির্ভাবের সাথে নতুন মাসের সূচনা হয় না, এবং বিগত মাস শেষ হয় না। বরং প্রতিটি মাসের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ইউরোপিয় এক পোপের একক ইচ্ছায়। কোন কারণ ছাড়াই বেশ কয়েকটি মাসের জন্য ৩০ দিন আর কয়েকটি মাসের জন্য ৩১ দিন বরাদ্দ করা হয়েছে। আর হতভাগা ফেব্রুয়ারী মাসকে কখনো ২৮ দিনের আবার কখনো ২৯ দিনের ধরা হয়।

এমনকি দিনকেও সূর্যের অবস্থানের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়নি। যেমন অনুমিত ভোর (সুবহে কাযেব), প্রকৃত ভোর (সুবহে সাদেক), সকালের পরিষ্কার আলো, দিনের উজ্জ্বল আলো, তারপর সূর্য ঢলে পড়া, আলোর নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া, গোধুলি, জোৎস্না, তারকার আলো, তারপর অন্ধকার, ঘন অন্ধকার, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গোচর ঘটনার সাথে সময়ের বর্তমান বিভাজনের কোন মিল নেই। বরং গাণিতিক ভাবে দিন ও রাতকে ২৪টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রতিটি ভাগকে বলা হয় ঘন্টা। আবার প্রতিটি ঘন্টাকে ৬০টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রতি ভাগকে বলা হয় মিনিট, ইত্যাদি। এটা জাগতিক সুবিধা ভোগ করার জন্য *সময়*-কে ব্যবহার করার একটা বিকৃত প্রচেষ্টা যা সময়ের প্রতি পবিত্র মনোভাবকে লালন করা থেকে বিরত রাখে।

পবিত্র *সময়* কৌশলগত ভাবে মানুষের আত্মাকে পূতপবিত্র জগতের দিকে আহ্বান জানাত। অতএব বলতে হয় পবিত্র সময়, মানব সমাজে ঋষিদের জন্ম দিত। ধর্মনিরেপক্ষ মতবাদ এবং সময়ের যান্ত্রিকরণের ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক জগতের সাথে সেই পবিত্র সম্পর্কগুলি ভেঙ্গে গেছে। ফলে সময়ের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে বস্তুবাদী জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে।

এটিও কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, বর্তমান যুগে গোরস্থানগুলি শহর বা নগরের বাইরে অবস্থিত। এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো পার্থিব ব্যস্ততায় মানুষের মন ও হৃদয়কে আবদ্ধ করে রাখা, যাতে মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে, তথা *সময়*-এর আরও যে মাত্রা আছে সে সম্পর্কে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা।

টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে সংবাদ ও ঘটনাপ্রবাহকে যেভাবে পরিবেশন করা হয়, তাতে মনে হয় এর প্রধান উদ্দেশ্য মানবসমাজকে প্রতিটি মুহুর্তের *বাঁধনে* আটকে রাখা। বিভিন্ন কাহিনী ও চিত্রসমূহ টেলিভিশনের পর্দায় যেভাবে দ্রুতগতিতে দেখানো হয় তাতে মানুষের চিন্তা ও গবেষণা শক্তি লোপ পেতে থাকে, এবং ক্রমান্বয়ে সেই শক্তি বিকৃত ও ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবনের দিন ও মুহূর্তগুলি অনেকটা বেখেয়াল অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। *গতকাল* অতীত হয়ে যায়, চেতনার উপর তার কোন প্রভাব পড়েনা। তেমনি *আগামীকাল* আজকের বাঁধনহারা স্বপ্ন-কল্পনার পুনরাবৃতি বৈ আর কিছুই না।

অতএব এটা সহজেই অনুমেয় যে, মানুষ বর্তমানের সাথে অতীতের সম্পর্ককে একত্র করার দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। অপর দিকে এসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা ভবিষ্যৎকে যথাযথভাবে অনুমান করতে পারছে না। তারা ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের ভেতরে *সময়*-এর ভূমিকাকে অনুধাবন করতে পারছে না। *সময়* কিভাবে ইতিহাসকে গড়ে তুলছে, সে বিষয়ে তারা সচেতন নয়। ফলে তারা পবিত্রভূমি জেরুযালেমের রহস্যপূর্ণ ভূমিকাকে চিনতে পারছে না বা বুঝতে পারছে না। এটাই হলো ইউরো-খ্রিষ্টান ও ইউরো-ইহুদিদের কর্মসূচি যা তারা বহু শতাব্দী ধরে লালন করে আসছে।

এই কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে ইউরো-ইহুদি ইসরাঈল রাষ্ট্র বিশ্বের তৃতীয় ও সর্বশেষ নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে, যার পরিণতিতে এক ভন্ড ব্যক্তি জেরুযালেম হতে সারা বিশ্বকে শাসন করবে এবং নিজেকে প্রতিশ্রুত মাসীহ হিসাবে দাবী করবে। আর এটিই হবে এক চরম প্রতারণা। তথাপি এই আধুনিক যুগ মুসলিম জগতকে অন্ধের মত তাদেরই অনুসরণ করতে সফলভাবে প্ররোচিত করেছে, যার পরিণতিতে মুসলমানেরাও তাদের পেছনে পেছনে প্রবাদবাক্যের *গিরগিটির গর্তের* দিকে ধাবিত হচ্ছে।

'সময়' এবং শেষ দিনের নির্দশনসমূহ

যখন 'সত্য' মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে তখনি সত্যধর্মের বিকাশ ঘটে। কার হৃদয় কত খাঁটি সেটা নির্ভর করে কে কিভাবে সময়কে অনুধাবন করে। প্রকৃতপক্ষে, কার হৃদয় কেমন, এই উপলব্ধির মাধ্যমে সেটাই প্রকাশ পায়। রাসূল (সা:) শেষ দিবসের যেসকল নির্দশন প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে:

"আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত: সময়ের গতি বাড়তে থাকবে; এক বছর মনে হবে এক মাসের মত, এক মাস মনে হবে এক সপ্তাহের মত, এক সপ্তাহ মনে হবে এক দিনের মত, এক দিন মনে হবে এক ঘন্টার মত, এবং এক ঘন্টা মনে হবে চুলা ধরাতে যে সময় লাগে তার মত।"

— তিরমিযী

সময় দ্রুত বয়ে যাবে, এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ কমে যাবে, আর সেখানে স্থান নিবে দুনিয়ার চিন্তা। এরূপ হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিকির নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিকির কী? যখন একজন ব্যাক্তি তার ভালবাসার রমণীর কথা হৃদয়ে অনুভব করে তখন তার হৃদয় এক মোহনীয় সৌরভে ভরে ওঠে। এটা সব সময় হয়ে থাকে। যখন সে তার নাম শোনে তখনো তাই হয়। এটাই যিকির বা স্মরণ করা।

এটা স্পষ্ট যে, স্মরণ করা তখনই সম্ভব যখন ভালোবাসা খাঁটি হয়। অতএব এটাই বাস্তব যে, যখন হৃদয় হতে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা দূরে সরে যায়, তখন সময় দ্রুত গতিতে ফুরিয়ে যায়। তাই বলা যায় যে, যখন আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা হৃদয়কে দখল করে নেয়, তখন নিশ্চিত ভাবে সময় ধীর গতিতে এগিয়ে যায়। তখন বিশ্বাসীর সকল আচরণ অর্থপূর্ণ ও হিতকর হয়ে ওঠে।

যে সকল হতভাগা মানুষ দুনিয়ার দ্রুত অস্তগামী সময়ের মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছে, তারা 'এখান' ও 'এক্ষণের' মধ্যে ডুবে আছে। তারা কখনোই সময়ের বাধ্যবাধকতা এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এর তাৎপর্যকে বুঝতে পারবে না। তারা নিজেদের করুণ অবস্থা সম্পর্কেও উদাসীন থাকবে এবং পরিশেষে এক অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে।

শেষ যুগে আধ্যাত্মিক শূন্যতার কারণে এমনভাবে নৈতিকতার ধ্বস নামবে যে:

" . . . মানুষ একে অপরের সাথে ব্যবসায়ী চুক্তি করবে কিন্তু কদাচিৎ তা পালন করবে।"

একদিকে আধ্যাত্মিক শূন্যতা আর অপর দিকে ভ্রষ্ট নৈতকতা মানুষের বিচার বিবেচনাকে এতটাই অক্ষম করে দিবে যে তারা সাধু আর ভন্ডের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না:

“ . . . এটা বলা হবে যে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক আছে। মানুষ তাকে বুদ্ধিমান, চমৎকার ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি বলে মনে করবে, যদিও তার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সরিষার দানা পরিমাণ বিশ্বাসও থাকবে না।”

— উপরোক্ত উদ্ধৃতি দু’টি নেয়া হয়েছে হুযায়ফা (রা:)-র বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম হতে

মহানবী (সা:) আরো সর্তক করেছেন যে সেই সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে:

“হুযায়ফা (রা:) হতে বর্ণিত: মহানবী (সা:) বলেছেন, লোভ বা প্রলোভন মানুষের হৃদয়ে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হবে যেমন বেতের বুনন দিয়ে মাদুর তৈরী করা হয়। হৃদয়ে প্রবেশ করার ফলে এগুলি একটা কালো দাগ সৃষ্টি করবে। ফলে আত্মা হবে দুই প্রকারের। এক প্রকার হবে সাদা পাথরের মত যা যতদিন আকাশ ও পৃথিবী রয়েছে ততদিন কোন প্রকার প্রলোভন দ্বারা আক্রান্ত হবে না। আর অপরটি হবে কালো এবং মাটির রঙ্গের যা দেখতে হবে উল্টে রাখা হাড়ির মত, যা কেবল মাত্র আবেগে ঢাকা থাকবে, অর্থাৎ যার মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের কোন ক্ষমতা থাকবে না।”

— সহীহ মুসলিম

এতে কোন সন্দেহ নেই যে তথাকথিত প্রগতির এই যুগে শেষ দিবসের নিদর্শনগুলি প্রকাশ পাচ্ছে।

বর্তমান সময় হলো ধর্ম নিরপেক্ষতার। এমনকি রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ধর্মনিরপেক্ষ, সেই সাথে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য (বাজার), গণমাধ্যম, খেলাধুলা, বিনোদন, ইত্যাদি সবই। এমনকি খাবার ঘর, বিশ্রামঘর এবং শোবার ঘরও ধর্ম নিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষতা শুরু হয় সৃষ্টিকর্তাকে পাশ কাটিয়ে, আর শেষ হয় তাকে অস্বীকার করে। যখন জ্ঞান ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়, তখন এই বিশ্বাস জন্মায় যে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিভিত্তিক তদন্ত। এই জ্ঞানতত্ত্বের সিদ্ধান্ত হলো: যেহেতু আমরা শুধুমাত্র বস্তু জগতকেই জানতে পারি, তাই বস্তু জগতের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এইরূপে ধর্মনিরপেক্ষতা বস্তুবাদের জন্ম দেয়, অর্থাৎ বস্তুর বাইরে কোন বাস্তবতা নেই, আর পার্থিব *সময়* ছাড়া সময়ের আর কোন মাত্রা নেই। বস্তুবাদ স্বাভাবিক ভাবেই লোভ, লালসা, মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার, খোদাহীনতা এবং বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রশ্রয় দেয়, কারণ ধর্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছাড়া নৈতিকতা টিকতে পারে না। অন্তরকে গড়ে তুলতে হলে যা কিছু অনুভূতির বাইরে রয়েছে, যেমন আল্লাহ্, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরী। এই ধারণা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়াও অর্থহীন হয়ে যেতে পারে যদি মনে করা হয় ‘এখানে’ ও ‘এখন’ ব্যতীত সময়ের আর কোন মাত্রা নেই।

জীবনের সাথে সময়ের সমন্বয়

জীবনের বছরগুলি আসে আর যায়। কে যে কী তা বুঝতে হলে দেখতে হবে কে কিভাবে এদিকে খেয়াল রাখে। "আমাকে বল কিভাবে তুমি বিগত বছরগুলির গণনা করেছ, তাহলে আমি তোমাকে বলে দিব তুমি কে?"

ওমর খৈয়্যাম বিগত বছর গুলির জন্য এভাবে শোক প্রকাশ করেছেন:

"নিশাপুর হোক বা ব্যাবিলন
পেয়ালাতে মিষ্টি ভরা হোক বা তিক্ততা
জীবন-সুরার ফোঁটাগুলি একে একে চুয়ে যায়
জীবনের পাতাগুলি একে একে ঝরে যায়।"

— রুবাইয়াত ওমর খৈয়্যাম

তবে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সময়ের প্রবাহ তাদের জীবনে এক ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। একইভাবে বিশ্বাসী মহিলারাও সময়ের গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে জীবনযাত্রায় এগিয়ে যায়।

যাদের সৌন্দর্যবোধ উন্নতমানের তারা অবশ্যই বলবেন আকাশে নতুন চাঁদ এবং তার পাশে একটি তারা যে চিত্র তৈরী করে, অন্য কোন কিছুর সাথে সেই সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। আকাশে নতুন চাঁদের আগমন, জীবনকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকেই চিহ্নিত করে।

এইরূপে একটি মেয়ের জন্ম আকাশে নতুন চাঁদের মত। এ যেন এক নতুন জগত। সে সকলেরই স্নেহার্হ। সবাই তাকে কোলে নেয়। তারপর সে হামাগুড়ি দেয়, সে হাটে, সে খেলে, সে হাসে, সে গান গায়, সে নাচে। ভাবনাহীন ভাবে সে তার শৈশব ও যৌবনের বসন্তকাল অতিক্রম করে। সে সত্যিই এক অপরূপ অলৌকিক দৃশ্য।

তারপর আসে তার জীবনের গ্রীষ্মকাল। লজ্জা তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়, যেমন বৃষ্টির পানি গোলাপের পাপড়ির উপর পড়ে রংধনু তৈরী করে। দুনিয়া তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, এবং তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সুবহান-আল্লাহ্‌। গায়করা তাকে নিয়ে গান করে, কবিরা লেখে কবিতা। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

তারপর শরৎকাল তাকে ঘিরে ধরে। তার জীবনের সবুজ পাতাগুলি হলুদবর্ণ হয়ে যায়। তার চোখের চারিদিকে রেখা দেখা দেয়, এখানে সেখানে সাদা চুল জেগে ওঠে।

সর্বশেষে চলে আসে শীতকাল, ঠিক যেমন চাঁদ তার চক্র শেষে পরিণত হয় খেজুর গাছের শুকনা ডালের মত (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৯)। সময় হলো এবার তাবু গুটাবার, বিদায় নেবার, রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার।

সময়ের ভেতর দিয়ে তার যাত্রা ছিল মহান আল্লাহ্-তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতার। সকল অবস্থাতে, তথা বসন্তে, গ্রীষ্মে, শরতে আর শীতে সে ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগী। শরৎ বা শীত চলে আসায় সে বিচলিত হয়নি। তার স্বাভাবিক কালো চুলের সাথে সাদা চুল মিশে যাওয়াতে সে গর্ববোধ করত। কোন মূল্যেই সে অতীতের বসন্ত বা গ্রীষ্মে ফিরে যেতে চায়নি, কারণ সে তার বর্তমান শরৎ বা শীতকালকে একইভাবে ভালবেসেছে। এভাবেই মাধুর্যের সাথে সে পরিণত বয়সে পা রাখে।

বয়স বাড়ার সাথে তার ভেতরের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ পেতে থাকে। তারপর যখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে নিতে আসে, যখন আকাশের অন্ধকারে চাঁদের অদৃশ্য হবার সময় আসে, এবং যখন অন্ধকার রাত্রি দুনিয়াকে ঢেকে ফেলে, তখন এখান থেকে চলে যাওয়াতে তার কোন দুঃখ থাকে না, যদিও এই পৃথিবীর বাইরে সে আর কিছুই চিনত না। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা নিয়েই সে পৃথিবীকে ত্যাগ করতে চায়, কারণ তিনি আরও উত্তম অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন (সূরা ইব্রাহীম, ১৪:৭)। সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে না। সে ভারত সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের মত বিলাপ করে না:

উম্‌রে দ্যরায মাঙ্গ ক্যর লায়ে থে চার দিন
দো আরযু মে ক্যট গ্যয়ে, দো ইন্তেযার মে

চার দিনের আয়ু মাগি আনিনু হেথায়;
কামনায় কাটিল দু'টি, দু'টি অপেক্ষায় ॥

অপর দিকে বিশ্বাসী মহিলা তার যাত্রায় *সময়ের* নতুন জগতে প্রবেশ করার জন্য সদা প্রস্তুত। সে কখনও সময়ের বিরোধিতা করেনি এবং সে কখনও আল্লাহ্‌কে অসম্মান করেনি, কারণ সে জানত যে আল্লাহ্‌ই সময়। যে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলে, সে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার সাথে সঙ্গতি রেখে চলে। যারা সময়কে ভেদ করে 'এইখান ও এক্ষণ'-কে অতিক্রম করতে পারে তারা আল্লাহ্‌র সেই সকল নিদর্শনগুলি ও শেষ দিবসের আলামতগুলি বুঝতে পারে, যা ইতিহাসের পরিক্রমার ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে।

সময়ের যে মাত্রার মধ্যে আমরা দিন ও রাত্রির পরিমাপ করে থাকি, জীবনের ও প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর পরিমাপ করে থাকি, সেগুলি আমাদেরকে দেয়া হয়েছে যেন আমরা এই পৃথিবীতে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের গমনাগমনকে হিসাব করতে পারি। এটি গোটা সময়ের একটি ক্ষুদ্রাংশ বটে। তবে এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে সময়ের অন্যান্য মাত্রার ভিত্তি, যার বর্ণনা কুর'আন শরীফে দেয়া রয়েছে। আমরা সময়ের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠি, এবং তাকে আমাদের নিজ অস্তিত্বের মধ্যে আর প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করতে শিখি। সেই সাথে শেষ যুগ এবং তার শেষ দিবস কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেটিকে বুঝতে পারার দক্ষতা অর্জন করি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই বর্তমান অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কুর'আনে সময়ের ধারণা

আল্লাহ্-তা'আলা সময়ের বিষয়টি কুর'আনের মধ্যে বিভিন্ন আয়াতে, তদুপরি রাসূল (সা:)-এর জীবন ও বাণীর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন, এবং অনুসন্ধানকারীর উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন যেন সে গলার হার তৈরী করার ন্যায় এই মুক্তাগুলিকে সংগ্রহ করে।

আমার সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা ডাঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (রা:) এই গলার হারকে "অর্থ বুঝতে পারার পদ্ধতি" (system of meaning) নামে অভিহিত করেছেন। কুর'আনে দেয়া সময়-সংক্রান্ত সেই মুক্তাগুলিকে চিহ্নিত করতে, এবং একটি গলার হারের ন্যায় সেগুলিকে একত্রিত করতে, আমরা এই অধ্যায়ে এক বিনীত চেষ্টা করেছি।

আরবরা সময় বা দাহ্রকে আদি সত্য হিসেবে গণ্য করত। তারা বিশ্বাস করত একমাত্র সময়ই শেষ পর্যন্ত থাকবে। অন্য সবাই শেষ হয়ে যাবে কারণ সময় সেগুলিকে ধ্বংস করে দিবে।

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ
وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

"তারা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কালের আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো শুধু ধারণা প্রসূতই কথা বলে।"

— সূরা জাসিয়া, ৪৫:২৪

আধুনিক খোদাহীন পাশ্চাত্য সভ্যতা, যারা বস্তু ছাড়া অন্য কোন বাস্তবতাকে মানে না, তারা বলে "সময় হলো টাকা"। সময় একটি পণ্যদ্রব্য বা ব্যবসার সামগ্রী, যা বেচা ও কেনা যায়। যখনই সুদে টাকা ধার দেয়া হয়, এই বাড়তি সুদকে সময়ের মূল্য হিসাবে যোগ করা হয়।

এর প্রতিউত্তরে এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্-তা'আলা নিজকে সময় (আদ-দাহ্র) বলে ঘোষণা দিয়েছেন:

"আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্র নবী (সা:) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান দাহ্র (সময়)-কে গালি দেয়। আমিই দাহ্র (সময়)। আমার হাতে দিন ও রাত্রি।"

— সহীহ বুখারী

যখন আল্লাহ্ জানালেন যে তিনি নিজেই সময়, তখন বুঝা গেল সময়ের একটি চূড়ান্ত অবস্থাও আছে, অর্থাৎ যার নিজেরই অস্তিত্ব রয়েছে, যা কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত নয়। আর যখন তিনি বলেন যে তার হাতেই রয়েছে দিন ও রাত, তখন বুঝে নিতে হবে যে, যে সময়কে আমরা চিনি সেটি আল্লাহ্‌র সময়ের তুলনায় আপেক্ষিক। আমরা যে সময়কে ভাগ করে দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, মাস, বছর, ইত্যাদির গণনা করি, তাকে ক্রমিক সময় হিসাবে অভিহিত করা যায়।

কুর'আনে বলা হয়েছে ক্রমিক সময় থেকেই সময়ের শুরু। এটি দেয়া হয়েছে ব্যবহারিক সুবিধার জন্য, যেন মানুষ বছরের হিসাব করতে পারে, এবং নিজেদের অস্থায়ী ক্ষণগুলির দিকে নজর দিতে পারে। ক্রমিক সময়েরও বাস্তবতা রয়েছে, অর্থাৎ এটি কোন অবাস্তব কল্পনা নয়।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ
مَا خَلَقَ اللَّـهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

"তিনি (আল্লাহ্), যিনি সূর্যকে ও চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন, এবং ওর (গতির) জন্যে মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরগুলির সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ্ এই সমস্ত কিছু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণাদি বিশদভাবে বর্ণনা করেন ঐসব লোকের জন্যে যারা জ্ঞানবান।"

— সূরা ইউনুস, ১০:৫

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

"আমি রাত্রি ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন। অতঃপর রাত্রিকে করেছি নিরালোক এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার, এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা স্থির করতে পার, এবং আমি সব কিছু বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছি।"

— সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১২

কুর'আনের বর্ণনা অনুযায়ী ক্রমিক (serial) সময় ও চূড়ান্ত (absolute) সময়ের মাঝখানে, সময়ের আরও সাতটি জগতের অবস্থানের কথা পাওয়া যায়, যেগুলিকে সাতটি আকাশ বলা হয়েছে। অনেক সময় ভুলবশতঃ এগুলিকে সাতটি বেহেশ্‌ত বলে অভিহিত করা হয়।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"যমিনে যা কিছু রয়েছে, তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি মনঃসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সববিষয়ে অবহিত।"

— সূরা বাকারাহ, ২:২৯

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছুই নেই যা তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ।"

— সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৪৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

"আমি তোমাদের উপর সপ্ত স্তর আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অসতর্ক নই।"

— সূরা মুমিনূন, ২৩:১৭

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

"জিজ্ঞেস করুন, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি?"

— সূরা মুমিনূন, ২৩:৮৬

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

"অতঃপর তিনি তাকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন, এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। এবং আমি দুনিয়ার আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করলাম। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।"

— সূরা হা-মীম সেজদাহ, ৪১:১২

اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّـهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

"আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যায় পৃথিবী; এসবের মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, এবং আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"

— সূরা তালাক্ব, ৬৫:১২

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?"

— সূরা মুল্‌ক, ৬৭:৩

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّـهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

"তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?"

— সূরা নূহ্, ৭১:১৫

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣

"আর নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত আকাশ এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি।"

— সূরা নাবা, ৭৮:১২-১৩

এই সাতটি মজবুত বস্তুকে প্রায়শই সাতটি স্বর্গ হিসাবে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এগুলো স্বর্গ নয়, বরং এগুলিকে সময় ও স্থানের সাতটি ভিন্ন জগত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, যা এই পৃথিবী ও মহান আল্লাহ্‌র আরশের মাঝে অবস্থিত। মহানবী (সা:) নিম্নের হাদীসে একথা উল্লেখ করেছেন।

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা:) হতে বর্ণিত: "একদা আমি মুহাম্মদ (সা:)-এর সাথে অন্যান্য সাহাবীদের মত আল-বাষায় বসে ছিলাম। এমন সময় তাদের উপর দিয়ে এক খন্ড মেঘ উড়ে গেল। মহানবী (সা:) উহার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং বললেন: তোমরা এটাকে কি বলে জান? তারা বলল, মেঘ। রাসূল (সা:) বললেন, এবং মুয্‌ন (muzn)? তারা বলল, হ্যাঁ মুয্‌ন। রাসূল (সা:) বললেন, আর আনান? তারা বলল, হ্যাঁ আনান। আবু দাউদ (রঃ) বলেছেন, আমি আনান শব্দটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না। রাসূল (সা:) আবার জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে কত দূরত্ব তা জানো? তারা বলল, আমরা জানি না। তখন রাসূল (সা:) বললেন, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব হলো একাত্তর, বাহাত্তর অথবা তেহাত্তর বছরের। তার উপরের আকাশের দূরত্ব ঠিক একই পরিমাণ (এভাবে তিনি সাতটি আকাশের গণনা শেষ করলেন)। সপ্ত আকাশের উপরে একটি সাগর আছে যার উপরিভাগ

হতে তলা পর্যন্ত দূরত্ব এক আকাশ হতে অপর আকাশের দূরত্বের সমান। তার উপর রয়েছে আটটি পাহাড়ি ছাগল যাদের খুর আর পশ্চাদ্‌দেশের দূরত্ব এক আকাশ হতে অপর আকাশের দূরত্বের সমান। মহান আল্লাহ্ রয়েছেন তারও উপরে।"

— আবু দাউদ

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এই সাত আসমানের প্রত্যেকটিতে একটি ভিন্ন '*আলাম* বা জগত বিদ্যমান রয়েছে। কুর'আন শরীফের প্রথমেই সূরা ফাতেহায় আল্লাহ্-তা'আলাকে জগতসমূহের (অর্থাৎ এই সাতটি জগতের সবকটির) প্রভু বলা হয়েছে।

الْحَمْدُ لِلَّـــهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্-তা'আলার যিনি সকল সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা।"

— সূরা ফাতেহা, ১:২

এর অর্থ এই যে, যেভাবে মহান আল্লাহ্ মানুষের জগতের প্রতিপালক, তেমনই তিনি যারা ঐ সকল জগতে বাস করে তাদেরও পালনকর্তা, এবং তাদেরও তাঁর ইবাদত করার কথা:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـــٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"

— সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৪৪

প্রকৃত পক্ষে কুর'আনে এই সাতটি বিশ্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে সময় ও স্থানের বিভিন্ন মাত্রা হিসাবে। যেমন, একটি জগতের কথা বলা হয়েছে যেখানে সময়ের মাত্রা এমন যে:

❖ এক দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের মত:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

"ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্-তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।"

— সূরা মা'আরিজ, ৭০:৪

এবং দ্বিতীয় আরেক বিশ্বের কথা বলা হয়েছে যেখানে সময়ের মাত্রা এমন যে:

❖ এক দিন এক হাজার বছরের মত:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّـهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

"তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্ কখনও তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।"

— সূরা হজ্ব, ২২:৪৭

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর সব কিছু তার কাছে পৌঁছাবে এমন এক দিনে, যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।"

— সূরা সেজদাহ, ৩২:৫

❖ এক দিন তিনশত বৎসরের মত:

কুর'আনে সূরা কাহাফের মধ্যে সময়ের সাথে দাজ্জালের সম্পর্ককে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে — সেই যুবকদের কাহিনীর মাধ্যমে যারা গুহার মধ্যে দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে জাগ্রত করলেন এটা দেখার জন্য যে, কে তাদের মধ্যে বলতে পারে যে তারা কতদিন এভাবে কাটিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা তিন শত বছর ঘুমিয়েছিল, কিন্তু তাদের মনে হলো যে তারা সেই অবস্থায় এক দিন অথবা দিনের এক অংশ কাটিয়েছিল।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾
ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

"তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানানোর জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:১১-১২

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ . . .

"আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল: তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ কেউ বলল: একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ; কেউ কেউ বলল: তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ . . ."

— সূরা কাহাফ, ১৮:১৯

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

"তারা তাদের গুহায় তিনশ' বছর, আরও নয় বছর ছিল।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:২৫

তাদের মধ্যে কিছু যুবক বলল যে তারা গুহার মধ্যে অবস্থান করেছে একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ মাত্র। অন্যরা আধ্যাত্মিক ভাবে নির্ণয় করেছে যে তাদের সাথীদের অনুমাণের তুলনায় তারা অনেক বেশী সময় কাটিয়েছে। বাস্তবিকই অনেকের ধারণায় এই যুবকেরা তিন শত সৌর বছর গুহায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল (যা ৩০৯ চান্দ্র বছরের সমান)।

❖ এক দিন একশত বছরের মত:

কুর'আন শরীফে আরেকটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। একদা এক ব্যাক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত এক শহরের (অর্থাৎ জেরুযালেম) পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। সে আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করল আল্লাহ্ কিভাবে এই শহরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আল্লাহ্-তা'আলা (রূপকভাবে) এক শত বছরের জন্য তার মৃত্যু ঘটালেন। তাকে জীবিত করে জিজ্ঞেস করা হলো কতদিন সে অতিবাহিত করেছে। সে উত্তরে বলল, "এক দিন বা তার কিছু অংশ":

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَـٰذِهِ اللَّـهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ
فَأَمَاتَهُ اللَّـهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ
قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ
وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

"অথবা সেই ব্যক্তির মত যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়িগুলি ছাদ সমেত ভেঙ্গে পড়েছিল? সে বলল: কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তাকে উঠালেন। তিনি বললেন: কতকাল এভাবে ছিলে? সে বলল: আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়। তিনি বললেন তা নয়, বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে সে গুলি পচে যায়নি, এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলির দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলিকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলির উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন সে বলে উঠল: আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।"

— সূরা বাক্বারাহ, ২:২৫৯

সময় ও স্থানের সাতটি মাত্রা পাশাপাশি বিদ্যমান, অর্থাৎ এটি এমন নয় যে যেখানে একটি শেষ হয় সেখানে অপরটি শুরু হয়:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্-তা'আলার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবেনা। দৃষ্টি ফেরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও?"

— সূরা মুলক, ৬৭:৩

এই পৃথিবীতে সময়ের বিভিন্ন মাত্রার সহাবস্থান কুর'আনের উপরোক্ত উক্তিতে (সূরা বাক্বারাহ, ২:২৫৯) বিস্ময়করভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যবিলনের হাতে ধ্বংস হবার পর জেরুযালেম শহরের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক পর্যটক চিন্তা করেছিল কে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরকে আবার জীবিত করবে।

পর্যটককে একশত বছরের জন্য মৃত্যুর মধ্যে রাখা হয়েছিল (ঘুম মৃত্যুরই আরেক রূপ), এবং তারপর তার চেতনা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। গুহার যুবকদের মতই সেই পর্যটক চেতনা ফিরে পাবার পর মনে করেছিল যে সে একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল। কিন্তু কুর'আনে স্পষ্টভাবে একই ঘটনার মাধ্যমে সময়ের দু'টি মাত্রার কথা বলা হয়, অর্থাৎ গাধার পরিণতি এক অবস্থায় আর খাদ্যের পরিণতি আরেক অবস্থায়। সময়ের স্বাভাবিক গন্ডির মধ্যে গাধাটি খাদ্যের অভাবে মারা গেল এবং তার শরীর পচে গেল এমনকি তার হাড়গুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু সময়ের অন্য এক গন্ডির মধ্যে খাদ্যকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল, একশত বছর পরেও তা একেবারে টাটকা ছিল। এই বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, সময়ের উভয় মাত্রা একই সাথে এই পৃথিবীতেই বিদ্যমান রয়েছে।

যে যুবকেরা গুহার মধ্যে তিনশত বছর ঘুমিয়েছিল তাদের ঘটনার ভেতরেও আমরা একই বিষয় লক্ষ্য করি। আমরা এই আলোচনা করব পরবর্তী অধ্যায়ে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের দেহ একাধারে সময়ের দু'টি মাত্রায় অবস্থান করছিল। প্রথম মাত্রায় তাদের শরীর সূর্যের গতির সাথে তাল রেখে সকাল থেকে বিকাল বাম দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে যেত। সময়ের দ্বিতীয় মাত্রায় তিনশত বছর গত হওয়া সত্ত্বেও তাদের শরীরে কোন জৈবিক পরিবর্তন দেখা দেয়নি।

সময় ও স্থানের বিভিন্ন মাত্রা একই সাথে বা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। এই অবস্থাকে *তিবাক্বা* শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখন আমরা বুঝতে পারি, কিভাবে অদৃশ্য নথিভুক্তকারী ফেরেশতারা, যাদের অবস্থান সময় ও স্থানের ভিন্ন এক মাত্রায়, পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের কাঁধের উপর

সর্বদাই অবস্থান করছে। ঠিক তেমনই আমরা বুঝতে পারি কিভাবে অদৃশ্য জ্বিন আমাদের চারিপাশে সর্বদাই অবস্থান করছে। তারা আমাদের চারিপাশে আছে, কিন্তু সময় ও স্থানের বিবেচনায় তাদের অবস্থান এক ভিন্ন মাত্রায়। সেকারণে আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতকে বিবেচনা করা যাক:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ
إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

"হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল, এবং তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করে দিয়েছিল। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।"

— সূরা আ'রাফ, ৭:২৭

'খাদ্য' এবং 'গাধা'-র উপরোক্ত বর্ণনায় শুধু যে এটাই জানা গেল যে সময়ের দু'টি জগত পাশাপাশি অবস্থান করে তাই নয়। 'খাদ্য' এজগতের সময়ের মধ্যে উপস্থিত ছিল, আবার দ্বিতীয় জগতেও ওটি একশত বছর সংরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ, ঘটনাটি সময়ের দু'টি মাত্রার মধ্যে চলাচল করছিল।

একই ব্যাপার ঘটেছিল সূরা কাহাফে বর্ণিত গুহার যুবকদের ক্ষেত্রে। তাদের দেহ জাগতিক সময়ের তিনশত বছর গুহায় ছিল, আবার সময়ের আরেক জগতে তাদের বয়োবৃদ্ধি হয়নি। অনুরূপভাবে ইসরা এবং মিরাজের ঘটনায় বিভিন্ন সময়ের ভেতর দিয়ে রাসূল (সা:)-এর আনাগোনা হয়েছিল।

যেহেতু রাসূল (সা:)-কে বোরাকের পিঠে উঠিয়ে পবিত্রভূমিতে নেয়া হয়েছিল, যেখান থেকে তিনি ঊর্ধাকাশে ভ্রমণ করেছিলেন, তাই মনে হয় যে কেবলমাত্র পবিত্রভূমি থেকেই সময়ের বিভিন্ন স্তরে আনাগোনা করা সম্ভব। অতএব, যে শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেটি নিশ্চয় জেরুযালেম ছিল, অর্থাৎ 'খাদ্য' ও 'গাধা'-র ঘটনাটি পবিত্রভূমিতেই ঘটেছিল। একই কারণে সূরা কাহাফে বর্ণিত গুহাটিও পবিত্র ভূমি বা তার আশেপাশে কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। আর এই পবিত্রভূমি হতে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ:)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। এবং যখন তাকে আকাশ হতে দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হবে তা হবে এই জেরুযালেমেরই আশেপাশে।

ডাঃ আনসারী ও বিবর্তনমূলক সময়

আমাদের সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা ডাঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান আনসারী (১৯১৪-১৯৭৪) এই ঐশ্বরিক হেদায়েতকে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর মত একই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন সৃষ্টি শুরু হয়েছিল 'কুন্' বা 'হয়ে যা' শব্দ দিয়ে, তবে বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃষ্টি বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন জগতে আবির্ভূত হয়। তিনি এক আলোর জগতের কথা বলেছেন, যেখানে ফেরেশতা জাতিকে আলো দিয়ে তৈরী করা হয়। তারপর আগুনের জগতে জ্বিন জাতির উদ্ভব ঘটে। সর্বশেষে কাদা মাটির পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাব ঘটে। ফলস্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অন্য সবকিছুর মত *সময়েরও* বিবর্তন হয়েছে, এবং তার মধ্যে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত *সময়* সেই অবস্থা ধারণ করেছে, যেভাবে আমরা ওটাকে চিনি।

এই অধ্যায়ে আমরা বলতে চেষ্টা করেছি যে সময়ের মধ্যে বিবর্তন এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দিকে এগিয়ে গেছে, অর্থাৎ সময়ের বিভিন্ন জগত এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বুঝতে পারলে পৃথিবীতে দাজ্জালের সময়কাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সেই হাদীসটি বুঝা যাবে। এখানে কুর'আনের সৃষ্টিতত্ত্ব তথা সময়ের বিবর্তন সম্পর্কে মাওলানার বর্ণনা তুলে ধরা হলো, যা নেয়া হয়েছে তাঁর The Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society নামক দুই-খন্ডে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হতে:

"সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্‌র সাথে গোটা বিশ্বের যে সম্পর্ক, তার দু'টি স্তরের কথা কুর'আনে প্রকাশ পায়; প্রথমটি হচ্ছে *আম্‌র* বা আদেশের স্তর, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে *খাল্‌ক্ব* বা সৃষ্টিকর্মের স্তর। এই দু'টিই একত্রিত হয়েছে আল্লাহ্-তা'আলার গুণবাচক নাম *আল-রাব্ব* বা পালক, রক্ষক, পরিবর্ধক ইত্যাদির মধ্যে:

. . . أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

". . . শুনে রেখ, তাঁর কাজই হচ্ছে সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

— সূরা আ'রাফ, ৭:৫৪

এমনি ভাবে সৃষ্টিজগতের বিবর্তন শুরু হয় আল্লাহ্‌র আদেশের মাধ্যমে:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

"তিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে এ কথাই বলেন, 'হয়ে যাও!' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।"

— সূরা বাক্বারাহ, ২:১১৭

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

"তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন, 'হও!' আর তা হয়ে যায়।"

— সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৮২

বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়কে *বাস্তবে পরিণত হওয়া* (from Being to Becoming) বলে ধরে নিতে হবে। আমরা এটিকে সূক্ষ্ম অস্তিত্বের পর্যায় বলতে পারি; অর্থাৎ যা বস্তুর মত স্থুল নয়, যা স্থানহীন ও সময়হীন।

কুর'আনে খোলাখুলি ভাবে দেয়া বিবর্তনের ধারণার আলোকে বুঝা যায় যে, আদি অণু বা Primeval Atom দিয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানেও অনুরূপ ধারণা দেয়া হয়েছে। হাদীসেও 'প্রথম সৃষ্ট আলোর' উল্লেখ রয়েছে যাকে সকল সৃষ্টির উৎস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম সৃষ্টি হিসেবে রাসূল (সা:)-এর এক বিশেষ মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। রাসূল (সা:)-এর সাহাবী জাবির (রা:) হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, এবং ইসলামের ইতিহাসের স্বনামধন্য পন্ডিতগণ এটিকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। এদের মধ্যে তফসীরকারক আল্লামা আলুসির বর্ণনা নিম্নরূপ (দেখুন তাঁর তফসীর *রূহুল মা'আনী* প্রথম খন্ড, পৃ ৫১):

জাবির (রা:) হতে বর্ণিত: "আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল আমাকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্ কোন জিনিসটি অন্য সব কিছুর আগে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (সা:) উত্তরে বললেন, মহান আল্লাহ্-তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করার আগে নিজের নূর থেকে তোমার নবীর নূর (আলো) সৃষ্টি করেছেন।" (আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল আল-নাবহানী *আল-আনওয়ার আল-মুহাম্মাদিয়া মিন মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া* [বৈরূত, ১৩১০ হিজরী], নামক গ্রন্থের দ্বাদশ পৃষ্টায় মুহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাকের বরাত দিয়ে এটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ইমাম বুখারীর পূর্বসূরি ছিলেন, এবং *আল-মুসান্নাফ* গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন)। হাদীসটি দ্বারা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ্ সেই আদি সৃষ্ট আলো থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। এই আলো-কে ইসলামের বিশিষ্ট পন্ডিতেরা *নূরে মুহাম্মাদিয়া* বলে চিহ্নিত করেছেন।

বির্বতনের এই প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী সৃষ্টির তুলনায় পরবর্তী সৃষ্টি সূক্ষ্মতা, পরিমার্জন, অস্পৃশ্যতা এবং গুণসম্পন্নতার দিক দিয়ে ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। পক্ষান্তরে প্রগতির ধারায় পরবর্তী সৃষ্টির স্থূলতা, অনুভবযোগ্যতা, ভিন্নতা এবং পরিমাপযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এটাই হচ্ছে *আল-খাল্‌ক্ব* বা সৃষ্টির মধ্যে এক জিনিষ থেকে আর এক জিনিষের উৎপত্তি, বা 'হয়ে যাওয়া'। এই প্রক্রিয়া সদা-সর্বদাই বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর সৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কুর'আন এবং বিজ্ঞান থেকে এই ধারণাই পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, কুর'আন এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। বির্বতনের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিষের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে, এবং বির্বতনের মাধ্যমেই সৃষ্টজগতে প্রগতির ধারা বজায় রয়েছে। অতএব এটা পরিষ্কার যে ফেরেশতা, জ্বিন ও মানুষ সকলেই সৃষ্টির পদার্থ-পূর্ব অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এবং সেই অবস্থাতেও ফেরেশতা ও জ্বিনেরা মানুষের আগে অস্তিত্ব লাভ করেছিল। কুর'আনে এই ধারণার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, (সূরা বাক্বারা, ২:৩০-৩৪)। আরও পরিষ্কার ভাষায় রয়েছে, কিভাবে সেই আত্মার জগতে মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির করা হয়েছিল, এবং আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করে অঙ্গিকারবদ্ধ হতে বলা হয়েছিল, (সূরা আ'রাফ, ৭:১৭২)। সৃষ্টির সেই পর্যায়, অর্থাৎ পদার্থের আবির্ভাবের আগেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল। অনুরূপভাবে নবীদের কাছ থেকেও ঐ অবস্থায় অঙ্গিকার গ্রহণ করা হয়েছিল, (সূরা আলে 'ইমরান, ৩:৮১)। এর দ্বারা বুঝা যায় যে সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে নবীরাও তাদের বিশেষ মর্যাদাসহ বিদ্যমান ছিলেন।

এসবের অর্থ এই যে সৃষ্টির প্রথম পর্যায় হতে প্রত্যেকটি জাতি ও বস্তুকে এক ক্রমাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যে চূড়ান্ত অবস্থা তার জন্য প্রয়োজনীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ, সেখানে উপনীত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে বিবর্তনের প্রক্রিয়া বন্ধ হবার কথা নয়, এবং বন্ধ থাকেনি। তবুও বলতে হয়, আল্লাহ্-তা'আলা প্রতিটি জিনিসের বৃদ্ধির একটি মাত্রা বা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অর্থাৎ ঐ অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সেই জাতি বা বস্তুর নিজস্ব বিবর্তন চলতে থাকবে।

. . . قَدْ جَعَلَ اللَّـــهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

" . . . আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা (*পরিণাম*)।"

— সূরা তালাক্ব, ৬৫:৩

ফলস্বরূপ, যখন কোন জিনিষ সম্ভাবনার জগত পেরিয়ে বাস্তব জগতে পূর্ণরূপে দেখা দিল, তখন সেই অবস্থাতেই তারা রয়ে গেল, যেমন ফেরেশতাগণ। অন্যান্যদের সৃষ্টি তখনো পূর্ণতা লাভ করেনি, অতএব তাদের বিবর্তন চলতে থাকল। এভাবেই সবার শেষে স্থান ও সময়ের জগতে মানুষ তার পূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করল।

— Qur'anic Foundations and Structure of Muslim Society, vol. 2, pp 16-17

উপরোক্ত বর্ণনাটি কুর'আনে প্রদত্ত সৃষ্টির বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়াকে ব্যক্ত করে। এই বর্ণনার মধ্যে নিহিত রয়েছে সময়েরও বিবর্তন, যা বিভিন্ন মাত্রার ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। সময়ের এক এক মাত্রায় এক একটি সৃষ্টি তার পূর্ণতা পেয়েছে। এভাবেই পরিশেষে সময় ও স্থানের সেই জগতের বিকাশ ঘটেছে যেখানে আমরা বাস করি ও মৃত্যুবরণ করি। অবশ্যই কুর'আন সাতটি ভিন্ন আকাশের অস্তিত্বের কথা বলেছে যা একে অন্যের পাশাপাশি অবস্থান করে, এবং এরই মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সময়েরও সাতটি মাত্রা

রয়েছে, যার ভেতর দিয়ে দুই দিকেই গমনাগমন করা যায়, এবং এর প্রত্যেকটিই পৃথিবীর জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?"

— সূরা মুলক, ৬৭:৩

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّـهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

"তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?"

— সূরা নুহ্, ৭১:১৫

অনুরূপভাবে সময় ও স্থানের বিভিন্ন মাত্রার ভেতর দিয়ে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে। পরিশেষে সে এই পৃথিবীতে এসে হাজির হয়েছে:

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾

"আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার; এবং রাত্রির, আর তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার; এবং চন্দ্রের, যখন তা' পূর্ণরূপ লাভ করে। নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর থেকে আরেক স্তরে আরোহণ করবে।"

— সূরা ইনশিক্বাক্ব, ৮৪:১৬-১৯

সত্য স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়। কখনো কখনো এগুলিকে দৈবস্বপ্নও বলা হয়। অন্য কথায় এগুলি এমন ঘটনা যা বিবর্তনের মাধ্যমে এখনো বিভিন্ন জগত পার হচ্ছে। সত্য স্বপ্ন অদৃশ্য জগতের বাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরবরাহ করে। রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন সত্য স্বপ্ন (এবং সেই সাথে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি) নবুয়ত শেষ হবার পরেও থাকবে। এর আরেকটা কাজ আছে। যখন মহান আল্লাহ্-তা'আলার বিশ্বাস হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তখন হৃদয়ের মধ্য থেকে দু'টি জিনিস প্রস্থান করে, ভয় ও দুশ্চিন্তা। এগুলির জায়গা দখল করে নেয় 'আশা' — এ জীবনের বিষয়ে ও পরবর্তী জীবনের বিষয়ে। যখন মু'মিন নিয়মিতভাবে সত্য স্বপ্ন দেখে, তখন তার আশা আনন্দে পরিণত হয়, যা তার আশা পূরণ হবার সাক্ষ্য বহন করে:

"যখন কেয়ামতের সময় উপস্থিত হবে, তখন মু'মিনদের (বিশ্বাসীদের) স্বপ্ন খুব কমই ব্যর্থ হবে; বিশ্বাসীদের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।"

— সহীহ বুখারী

স্বপ্ন বা দৈবস্বপ্ন সত্যে পরিণত হবার কারণ এই যে, *ঘটে যাবার আগেই সেগুলি অস্তিমান ছিল*। অন্য কথায়, ঘটনাটির সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয় স্বর্গীয় আদেশ 'হও' (কুন্) থেকে। তারপর সেটা সময় ও স্থানের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে বস্তু জগতে সংঘটিত হয়। পৃথিবীতে ঘটে যাবার আগেই যখন সেটি গোচরে আসে, এবং সমাজে সেটিকে স্বপ্ন হিসেবে প্রকাশ করা হয়, এমন স্বপ্নকেই সত্য স্বপ্ন বা দৈবস্বপ্ন বলা হয়।

অর্থাৎ সত্য স্বপ্নকে বিশ্বাস করলে, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে সময় ও স্থানের আরও যে অস্তিত্ব রয়েছে তা বিশ্বাস করতে হবে, যাকে অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা বলা হয়। আধ্যাত্মিক 'বস্তু' বিবর্তনের ধাপগুলি পেরিয়ে যখন পদার্থের 'আকার' ধারণ করে তখনি সেটি আমাদের জগতে অস্তিত্ব লাভ করে। এই 'আকার'-গুলিকে আল্লাহ্-তা'আলা 'আয়াত' বা প্রতীক হিসেবে 'গড়ে' তোলেন; যার উদ্দেশ্য সেগুলির মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলা।

আর তাই, একটি সত্য (ভবিষ্যদ্‌বাণীমূলক) স্বপ্ন আসলে একটি ঘটনা, যার অস্তিত্ব শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। এটি পরবর্তীতে পদার্থ-জগতে নির্গত হয় এবং বাস্তব স্বপ্নের আকার ধারণ করে।

এটি পরিষ্কার যে, আমরা সেই মিলনস্থল নির্ধারণ করতে পারিনা, যেখানে প্রথম আকাশ বা স্তর শেষ হয়েছে আর দ্বিতীয় আকাশ বা স্তর শুরু হয়েছে। সেটা সম্ভব নয়, তার কারণ প্রত্যেক আকাশের নিজস্ব মাত্রা রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে আকাশগুলি লম্বভাবে একটার উপর আরেকটা চাপিয়ে দেয়া রয়েছে, বরং সেগুলি নিজ নিজ মাত্রা বজায় রেখে একে অপরের সাথে মিশে রয়েছে। অতএব, এক আকাশ থেকে আরেক আকাশে প্রবেশ করার জন্য মহাকাশ যানের সাহায্যে হাজার হাজার আলোকবর্ষ ভ্রমণ করার প্রয়োজন নেই। *যে কোনো মুহূর্তে এক মাত্রা থেকে বেরিয়ে আরেক মাত্রায় প্রবেশ করা যায়।* একাজ করার জন্য কোনো কর্মচাঞ্চল্যের প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ সময় ও স্থানের ভেতরে নড়াচড়ারও প্রয়োজন নেই। আমরা যখনি নামায বা সালাতের জন্য দাঁড়াই, তখনি এটা করতে পারি। এখানেই পাওয়া যায় রাসূল (সা:)-এর ইসরা ও মি'রাজের অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা, যখন তিনি মক্কা হতে জেরুযালেম পর্যন্ত এবং তারপরে সপ্তাকাশের ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থানের মাত্রার ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে ঈসা (আ:)-এর স্বর্গারোহণ, এবং আমাদের সময় ও স্থানের মধ্যে ফিরে এসে দাজ্জালের অশুভ মিশন সম্পূর্ণ করার ব্যাখ্যা। ঈসা (আ:) দু'হাজার বছর কাটিয়ে ফিরে আসবেন, কিন্তু সেটা তাঁর আসল বয়সের সাথে যোগ হবে না।

সূরা ফাতেহা ও 'সময়'-এর বিভিন্ন জগত

মহানবী (সা:) বলেছেন যে, সূরা ফাতেহা কুর'আনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এই সূরার সাথে তুলনা করার মত কোন কিছুই পূর্ববতী আসমানী কিতাবগুলিতে নেই। এবং এই সূরার মধ্যে রয়েছে সকল রোগের নিরাময়। নিম্নের হাদীসটি দেখুন:

আবু সাঈদ আল মুয়াল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত: "একদা আমি নামাযের মধ্যে ছিলাম যখন রাসূল (সা:) আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) আমি নামাযে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কি বলেন নাই তাঁর হুকুম পালন করতে, এবং তাঁর নবীর ডাকে সাড়া দিতে? (সূরা আন্‌ফাল, ৮:২৪)। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাকে কুর'আনের সর্বোত্তম সূরা কী তা জানাবো না? তিনি বললেন, এটি হলো সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্বের মালিক (অর্থাৎ সূরা ফাতেহা) যা সাতটি আয়াতে গঠিত এবং বারবার পাঠ করা হয়। কুর'আনের এই চমৎকার সূরাটি আমাকে দেয়া হয়েছে।"

— সহীহ বুখারী

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন: "আনন্দিত হও! দু'টি আলো তোমাদের জন্য আনা হয়েছে, যা অন্য কোন নবী আনেন নাই: সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত (২:২৮৪-২৮৫)।"

— সহীহ মুসলিম

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন যে: "যার হাতে আমার আত্মা, আমি তার শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতেহার মত কোন সূরা তৌরাতে নেই, ইঞ্জিলে নেই, যাবুরে নেই, এমনকি পবিত্র কুর'আনের অন্যত্র নেই।"

— জামে' তিরমিযি

আব্দুল মালিক বিন উমায়র (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন: "সূরা ফাতেহা হলো সকল রোগের নিরাময়।"

— তিরমিযি, দারেমী ও বায়হাকী

আলাকাহ বিন সাহার আত-তামিমি (রা:) হতে বর্ণিত: একদা আলাকাহ (রা:) আল্লাহ্‌র নবী (সা:)-এর নিকট আসলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর নিকট হতে ফেরার পথে তিনি কিছু মানুষকে দেখলেন যাদের সাথে এক পাগল বেড়ী পরা অবস্থায় ছিল। তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আপনাদের সাথী ভাল অনেক কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনার কাছে কি কিছু আছে যার দ্বারা আপনি এর রোগ দূর করতে পারেন? তখন আমি সূরা ফাতেহা পাঠ করলাম এবং সে সুস্থ হয়ে গেল। তারা আমাকে একশত ভেড়া দিল। তখন আমি রাসূল (সা:)-এর নিকট আসলাম এবং বিষয়টি তাঁকে জানালাম।

তিনি বললেন, শুধু এটাই? বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ তার অপর বর্ণনায় বলেছেন, তুমি কি আর অন্য কিছু বলেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি (নবী (সা:)) বললেন, তুমি এটাই গ্রহণ কর। আমার জীবনের কসম, অনেকে এটাকে মূল্যহীন গলার চেনের পরিবর্তে গ্রহণ করে, কিন্তু তুমি তা করেছ মূল্যবান জিনিষের জন্য।

— সুনান আবু দাউদ

আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত: একদা রাসূল (সা:)-এর কিছু সাহাবী সফরে বের হলেন। রাতে তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছলেন, এবং তাদেরকে বললেন আমরা তোমাদের মেহমান হতে চাই। কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করল না। সেই রাতে তাদের গোত্র প্রধানকে সাপে কামড়াল (অথবা বিছায় হুল ফুটাল)। গোত্রের লোকজন তার চিকিৎসার জন্য সকল চেষ্টা করল কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। তখন গোত্রের কিছু লোক বলল তোমরা এখানে যারা রাত কাটাতে এসেছে তাদের কাছে যাও, হয়ত তাদের কাছে কিছু থাকতে পারে। তখন তারা রাসূল (সা:)-এর সাহাবীদের নিকট আসল এবং বলল আমাদের গোত্র প্রধান সাপের কামড়ের শিকার হয়েছেন (অথবা বিছায় হুল ফুটিয়েছে) এবং আমরা সকল চেষ্টা করেছি কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। তোমাদের নিকট কী কোন কিছু আছে? তখন সাহাবীদের একজন বলল, হ্যাঁ আছে, আমি একটি দোয়া (রুক্ইয়া) জানি কিন্তু যেহেতু তোমরা আমাদেরকে মেহমান হিসেবে নিতে অস্বীকার করেছ, তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই দোয়া পাঠ করব না যতক্ষণ তোমরা এর বিনিময়ে কিছু না দিবে। তখন তারা এক পাল ভেড়া দিতে রাজি হয়ে গেল। তখন সাহাবীদের একজন আল্লাহ্‌র নামে সূরা ফাতেহা পাঠ করল (সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালকের জন্য, ইত্যাদি), এবং গোত্র প্রধানের উপর ফু দিয়ে দিল। এর ফলে গোত্র প্রধান যেন বেড়ী থেকে মুক্তি পেল, এবং সুস্থ হয়ে গেল। সে উঠে দাড়াল এবং হাঁটাচলা করতে লাগল, যেন তার কোন কষ্টই ছিল না। তারা চুক্তি আনুযায়ী সাহাবীদের পাওনা মিটিয়ে দিল। সাহাবীরা তাদের উপার্জন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাইলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তেলাওত করেছিলেন, তিনি বললেন: "তা না করে আমরা রাসুলুল্লাহ (সা:)-কে সব বলব, তারপর তিনি যা বলবেন তাই করব।" পরবর্তীতে যখন সাহাবীরা রাসূল (সা:)-এর নিকট পৌঁছলেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) বললেন: "তুমি কি করে জানলে যে রুক্ইয়া হিসেবে সূরা ফাতেহা পড়া যায়?" তারপর তিনি বললেন: "তুমি সঠিক কাজটি করেছ, তোমরা যা উপার্জন করেছ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও আর আমাকেও একটা অংশ দাও।" এর পর নবী (সা:) মৃদু হাসলেন।

— সহীহ বুখারী

আল্লাহ্ ভাল জানেন, তবে আমরা মনে করি উপরোক্ত হাদীসগুলি এই ইঙ্গিত বহন করে যে, সূরা ফাতেহার সাতটি আয়াতের মধ্যে এক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সত্যিকার বান্দা নামাযের ভেতরে আসমান ও জমিনের সাতটি মাত্রা ভেদ ক'রে

এক সময়হীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে। এটিকেই মু'মিনদের মি'রাজ বলা হয়েছে।

অপর কথায়, নামাযের শুরুতেই সূরা ফাতেহা তেলাওতের সাথে অলৌকিক ঊর্ধগমন তথা মি'রাজ শুরু হয়। সূরা ফাতেহার সাতটি আয়াত এক এক করে নামাযিকে প্রথম থেকে সপ্তম আসমানে নিয়ে যায়। তারপর যখন সে আমীন বলে, তখন সে আধ্যাত্মিক অর্থে আল্লাহ্‌র আরশে উপনীত হয়, এবং বাকি নামাযের রাকাত সমূহ মহান আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে আদায় করে।

এখানেই বুঝা যায় কেন মহানবী (সা:) সর্বদাই সূরা ফাতেহার প্রত্যেকটি আয়াতকে পৃথক ভাবে তেলাওত করতেন, অর্থাৎ তিনি কখনও একটি আয়াতকে পরের আয়াতের সাথে মিলিয়ে তেলাওত করেন নাই। যারা বিসমিল্লাহ-কে সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াত হিসাবে মনে করেন না, তাদের একটু ভেবে দেখতে হবে যে, বিসমিল্লাহ-ই সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াত, এবং এটিকে বাকি ছ'টি আয়াতের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে পড়া উচিত।

উপরের আলোচনার সারমর্ম হিসাবে আমরা সময়ের সাতটি জগত বা মাত্রাকে চিহ্নিত করেছি। সেগুলি হলো:

১. একদিন ৫০,০০০ হাজার বছরের মত,
২. একদিন ১০০০ হাজার বছরের মত,
৩. একদিন ৩০০ বছরের মত,
৪. একদিন ১০০ বছরের মত,
৫. একদিন ১ বছরের মত,
৬. একদিন ১ মাসের মত, এবং
৭. একদিন ১ সপ্তাহের মত।

এখন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কিত সেই হেঁয়ালিমূলক হাদীসটি পর্যালোচনা করে দেখতে পারি, যাতে বলা হয়েছে যে সে পৃথিবীতে ৪০ দিন থাকবে।

'সময়'-এর মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব

'সময়'-এর রহস্য না বুঝা পর্যন্ত কেউ ভুয়া মাসীহ দাজ্জালের বিষয়টিকে বুঝতে পারবে না। স্পষ্টতই মহানবী (সা:) দাজ্জালের মিশনকে ব্যক্ত করতে গিয়ে 'সময়'-কে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন: *যখন সে ছাড় পাবে, সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন থাকবে; যার একদিন হবে এক বছরের মত; একদিন হবে এক মাসের মত; একদিন হবে এক সপ্তাহের মত; বাকি দিনগুলি হবে তোমাদের দিনের মত।*

— সহীহ মুসলিম

এখন এটি পরিষ্কার যে, দাজ্জাল সময় ও স্থানের তিনটি স্তর পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের জগতে বাস্তব রূপ ধারণ করবে যেখানে আমরা তাকে দেখতে পাব। বস্তু জগতে জেরুযালেমে আত্মপ্রকাশ করার আগের এই তিনটি পর্যায়ে দাজ্জাল পৃথিবীতে কোথায় অবস্থান করবে তার ব্যাখ্যা আমরা *পবিত্র কুর'আনে জেরুযালেম* গ্রন্থে দিয়েছি।

তবু আরো প্রশ্ন রয়ে যায়:

❖ এক বছরের সমান একদিনের মেয়াদ কত দীর্ঘ হবে ?
❖ এক মাসের সমান একদিনের মেয়াদ কত দীর্ঘ হবে?
❖ এক সপ্তাহের সমান একদিনের মেয়াদ কত দীর্ঘ হবে?

যেহেতু সময় ও স্থানের অন্যান্য মাত্রাকে মেপে দেখার কোন উপায় আমাদের নেই, অতএব নিখুঁত ভাবে বলা যাবে না *একদিন এক বছরের* মত কত লম্বা সময় হতে পারে। অনুরূপভাবে পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি ব্যবহার করে *একদিন এক মাসের* মত এবং *একদিন এক সপ্তাহের* মত আসলে কত সময় হবে তা সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে, আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, দাজ্জাল সময়ের যে তিনটি মাত্রা (অর্থাৎ বছর, মাস ও সপ্তাহের সমান দিনগুলি) পাড়ি দিবে সেগুলির প্রথমটি হবে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়, দ্বিতীয়টি হবে তার চেয়ে কিছু কম, এবং শেষটি হবে সবচেয়ে কম। এও বলতে পারি যে, সে যখন সময়ের এক গণ্ডি থেকে আরেক গন্ডির মধ্যে পদার্পন করবে, তখন অবশ্যই কিছু পদচিহ্ন রেখে যাবে, যা দেখে আমরা বুঝতে পারব যে, সে এখন কোন গন্ডির মধ্যে রয়েছে। এর দ্বারা আমি বলতে চাই যে, আমাদের উচিত হবে ইতিহাসের গতিধারাকে গভীর মনোযোগের সাথে রাসূল (সা:)-এর হাদীসের আলোকে পর্যবেক্ষণ করা। তাহলেই আমরা তার চলাফেরাকে চিনতে পারব, এবং এক 'দিন' থেকে আরেক 'দিনে' সে কিভাবে প্রবেশ করছে তা সঠিকভাবে অনুমান করতে পারব।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা এখন দাজ্জালের পার্থিব জীবন এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সেই ক্ষণে বাস করছি যখন *একদিন এক মাসের* মত প্রায় শেষ হবার পথে, আর *একদিন এক সপ্তাহের* মত শুরু হতে যাচ্ছে।

যখন দাজ্জাল *একদিন এক বছরের* মত সময়ে অবস্থান করছিল, আমরা লক্ষ্য করেছি তখন ব্রিটেন তার সদর দপ্তর ছিল, এবং সেকারণে তখন ব্রিটেন সমগ্র বিশ্বের উপর শাসন করেছিল। অনুরূপভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি যখন দাজ্জাল *একদিন এক মাসের* মত সময়ে প্রবেশ করে তখন তার সদর দপ্তর চলে গেল যুক্তরাষ্ট্রে, এবং ব্রিটেনের উত্তরসূরী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে শাসন করতে লাগল। যখন *একদিন এক মাসের* মত শেষ হয়ে *একদিন এক সপ্তাহের* মত শুরু হয়ে যাবে, তখন আমরা দেখব যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে অন্য একটি রাষ্ট্র গোটা বিশ্বের উপর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

এই লেখকের বিশ্বাস যে, ইসরাঈলের ইহুদি রাষ্ট্র একটি যুদ্ধ বাধাবার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো ফোরাত নদীর দু'ধারের দেশগুলির (যথা, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, এবং উপসাগরীয় রাষ্ট্র সমূহ) নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয়া ও তাদের তেলের ভান্ডার দখল করা। অবশ্যই ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র এই আক্রমণে ইসরাঈলকে সহায়তা দিবে।

রাসূল (সা:) এসকল যুদ্ধের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন (অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইরাকের সাথে যুদ্ধ করে তাদের তেল সম্পদ দখল করবে; এবং ইসরাঈলের আসন্ন আক্রমণ, ইত্যাদি)। তিনি বলেছেন:

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) বলেছেন, "শীঘ্রই ফোরাত নদী তার সম্পদ (পর্বত-প্রমাণ স্বর্ণ-ভান্ডার) বের করে দিবে। যে সেখানে থাকবে, সে যেন এটি থেকে কিছু না নেয়।" আল-আ'রাজ আবু হুরায়রার উদ্ধৃতি দিয়ে একই কথা বলেছেন যে, "ইহা (ফোরাত নদী) নিজের ভেতর থেকে স্বর্ণের পাহাড় উগলে দিবে।"

— সহীহ বুখারী

উবাই বিন কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত: আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:)-কে বলতে শুনেছি, "শীঘ্রই ফোরাত নদী সোনার পাহাড় উন্মোচিত করবে এবং যখন মানুষ এই বিষয়টি শুনবে তখন তারা সেখানে ভীড় করবে, আর বলবে: যদি আমরা এদেরকে কিছু অংশ নিতে দেই তাহলে তারা সম্পূর্ণটাই নিয়ে যাবে। ফলে তারা যুদ্ধ করবে এবং শতকরা নিরানব্বই জনই নিহত হবে। আবু কামিল তার বর্ণনায় বলেছেন: হাসান (রা:)-এর নেতৃত্বে এক যুদ্ধে আমি এবং আবু কা'ব তাঁবুর নীচে একত্রে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

— সহীহ মুসলিম

আমি মনে করি, ইতোমধ্যেই ইরাকে যে বিপুলসংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, সেটারই ইঙ্গিত এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে (প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন) রয়েছে যাতে বলা হয়েছে ফোরাত নদী সোনার পাহাড় উগলে দিবে। অবশ্য এটাও হতে পারে যে এই হাদীসে অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের কথা রয়েছে, যার মাধ্যমে আরও বহুগুণ মানুষের মৃত্যু হবে।

আমার বিশ্বাস, ইসরাঈল ঐ বড় যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে তাদের রাজত্বকে মিশরের নীল নদী হতে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত, অর্থাৎ বাইবেলে গুঁজে দেয়া তাদের কাল্পনিক সীমানা পর্যন্ত বাড়িয়ে নিবে। আমার ধারণা, সেই সাথে মার্কিন ডলারে ধস নামবে এবং আমেরিকানদের অর্থনীতি ও ক্ষমতা এতটা খর্ব হয়ে পড়বে যে তখন ইসরাঈল পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্র হিসাবে তাদের জায়গা নিয়ে নিবে। তার কারণ হলো, ইসরাঈলের পারমাণবিক আক্রমণ সেখানকার তেলসম্পদ, যাকে রাসূল (সা:) সোনার পাহাড় বলেছেন, দখল করে নিবে, যার ফলে নাটকীয় ভাবে তেল ও সোনার দাম বেড়ে যাবে। এরই পরিণতিতে প্রতারণাপূর্ণ ডলার অকেজো হয়ে পড়বে। তেলের দাম এমনিতেই এতটা বেড়ে গেছে যে

এর পরবর্তী মূল্যবৃদ্ধি ইসরাঈলের হাতে সেই বিশেষ ক্ষমতা তুলে দিবে, যা ব্যবহার করে সে গোটা বিশ্বকে জিম্মি করে ফেলতে পারবে। ফলস্বরূপ, এই জ্বালানী ব্ল্যাকমেইলকে কাজে লাগিয়ে স্রষ্টার 'পছন্দকৃত' জাতি অর্থাৎ ইহুদিরা তথাকথিত 'পবিত্র ইসরাঈল'-কে পৃথিবীর নতুন নিয়ন্তা-রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এটা হতে পারে যে, এই অধমই সর্বপ্রথম যে দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে। তবুও তার মানে এই নয় যে ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য নয়, অথবা ইসরাঈলের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের সংকল্পে লাগাম টানতে হবে। আশা করা যায়, সামনের ঘটনাগুলি রাসূল (সা:)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণিত করবে, এবং সত্য ও ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করবে। সে যাই হোক, যেহেতু এই মুহূর্তে এটি আমাদের একান্ত ধারণা, তাই আদবের খাতিরে কুর'আন ও হাদীসের ধর্মীয় প্রতীকগুলির ব্যাখ্যায় একথা যোগ করা উচিত হবে যে, 'তবে, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন'।

পরিশেষে, যদি আমরা আমাদের সময়ের পরিমাপ ব্যবহার করে দাজ্জালের 'বছর সমান দিন' এবং 'মাস সমান দিন' মাপতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা তার 'সপ্তাহ সমান দিনের' মেয়াদের একটা ভাল ধারণা করতে পারব, যা অবশ্যই আগের দিনের তুলনায় নাতিদীর্ঘ হবে। তারপরই আমরা আশা করব যে, দাজ্জাল আমাদের সময় ও স্থানের পৃথিবীতে এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে, যার ভবিষদ্‌বাণী রাসূল (সা:) করেছেন। তারপর সে যুবক অবস্থাতেই সমগ্র দুনিয়ার উপর শাসন করবে। সেই অবস্থায় সে নিজেকে মাসীহ হিসেবে পরিচয় দিবে। যখন ইহুদিরা সম্পূর্ণ ভাবে তার (মিথ্যা) দাবীকে গ্রহণ করে নিবে, তখনই তার মিশন পূর্ণতা লাভ করবে।

পাঠক আমাদের এই ব্যাখ্যা *পবিত্র কুর'আনে জেরুযালেম* গ্রন্থে আবার দেখে নিতে পারেন। সেখানে আমরা দাজ্জালের মিশনের তিনটি পর্যায়ের বর্ণনা দিয়েছি, যার শেষে দাজ্জাল জেরুযালেম থেকে দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করবে এবং বিজয়ীর মত ঘোষণা দিবে যে সে-ই সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ।

প্রথম পর্যায়ে, যা দীর্ঘ মেয়াদী ছিল, এক ব্রিটিশ বিশ্ব-ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক নিপীড়ন চালিয়ে বাকি পৃথিবীকে দমন করেছিল, এবং শেষে অত্যন্ত চালাকির সাথে পবিত্র-ভূমিকে 'স্বাধীন' করতে সক্ষম হয়েছিল।

সেই মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে — যা এখনো শেষ হয়নি, প্রথম পর্যায়ের তুলনায় কম মেয়াদী এই সময়কালে — মার্কিন বিশ্ব-ব্যবস্থা ব্রিটিশ বিশ্ব-ব্যবস্থার জায়গা নিয়েছে, এবং অবিশ্বাস্য ভাবে উদ্ধত, হামলাবাজ ও প্রসারণরত ইউরো-ইহুদি রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ সিকিউরিটি কাউন্সিলের অসংখ্য ভিটোর মাধ্যমে আশ্রয় দিয়ে চলেছে।

তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে, যা আগের দু'টির তুলনায় আরও সংক্ষিপ্ত হবে, আমরা দেখব মার্কিন বিশ্ব-ব্যবস্থাকে অপসারণ করে ইহুদি বিশ্ব-ব্যবস্থা জায়গা করে নিয়েছে। তখন ভুয়া মাসীহ গোটা পৃথিবীর উপর দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে নিষ্পেষণ চালিয়ে যাবে।

পবিত্র কুর'আনে জেরুযালেম গ্রন্থে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি তুলে ধরেছি তা হলো এই যে, দাজ্জালের মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় এখন প্রায় শেষের পথে, এবং তার তৃতীয় পর্যায় শুরু হবার ক্ষণ একেবারে আসন্ন।

এখন আমরা চেষ্টা করব রাসূল (সা:)-এর সেই দুরূহ হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে যেখানে তিনি দাজ্জালের যে সকল দিন বছর, মাস ও সপ্তাহের সমান হবে, সেই দিনগুলিতে কিভাবে নামায পড়তে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 'সময়' হিসাব করে নিতে হবে:

আন-নাউওয়াস বিন সাম'আন (রা:) হতে বর্ণিত: একদিন সকালে রাসূল (সা:) দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। কখনো তার সম্পর্কে এমনভাবে বলছিলেন যেন সে কিছুই না, আবার কখনো তার ফেৎনাকে এমনভাবে বলছিলেন, (যাতে আমাদের মনে হচ্ছিল) যে সে যেন পাশেই খেজুর বাগানের ঝোপের মধ্যে রয়েছে। . . . আমরা জিজ্ঞেস করলাম: "হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা:), সে কতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে?" তিনি বললেন: "চল্লিশ দিন, একদিন এক বছরের মত, একদিন এক মাসের মত, একদিন এক সপ্তাহের মত, আর বাকি দিনগুলি হবে তোমাদের দিনের মত।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম: "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:), তার যেদিন এক বছরের মত হবে, সেদিন কী একদিনের নামাযই যথেষ্ট হবে?" উত্তরে তিনি বললেন: "না, বরং তোমরা সময়ের অনুমান করে নিবে (এবং সেই অনুযায়ী নামায আদায় করবে। . . ."

— সহীহ মুসলিম

মহান আল্লাহ্-তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টি করার পর সময় ও স্থানের আরো সাতটি জগৎ (*সার'আ সামাওয়াত*) তৈরী করলেন, যা আমাদের পৃথিবী থেকে ভিন্ন। এই জগৎগুলি দুনিয়া আর আল্লাহ্‌র আরশের মাঝখানে অবস্থিত।

মহানবী (সা:) বলেছেন যখন দাজ্জাল মুক্তিলাভ করবে, সে পৃথিবীতে সময় ও স্থানের তিনটি ভিন্ন মাত্রা অতিক্রম করবে। তারপরই সে পৃথিবীতে আমাদের সময় ও স্থানের মাত্রায় জন্মগ্রহণ করবে, তখন তার দিনগুলি হবে আমাদের দিনের মতই।

যদি কোন মুসলমান এই সাতটি আসমানের (তথা সময় ও স্থানের সাতটি মাত্রার) যে কোনটিতে প্রবেশ করে, যেমন রাসূল (সা:) মি'রাজের ক্ষেত্রে করেছিলেন, তাহলে তাকে সেই আসমানের সময় ও স্থানের মাত্রা অনুযায়ী নামাযের সময় হিসাব করতে হবে। কবরের মধ্যে নামায আদায় করার ক্ষেত্রেও এটাই প্রযোজ্য। মহানবী (সা:) কবরের মধ্যে নামাযের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রসুল (সা:) বলেছেন, "আমি রাত্রি-যাত্রা বা *ইসরা*-র সময় লাল পাহাড়ের কাছে মূসা (আ:)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং দেখলাম তিনি কবরের ভেতরে নামায পড়ছেন।"

— সহীহ মুসলিম

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেন: আল্লাহ্‌র নবী (সা:) বলেছেন, "লাশকে কবরে দাফন করার পর তার সামনে সূর্য অস্ত যাওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়। তখন সে উঠে বসে এবং চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায আদায় করব।"

— সুনান ইবনে মাজাহ

রাসূল (সা:), সেই মহাপরিকল্পনা এবং ৬৬৬

আমি বিশ্বাস করি যে, রাসূল (সা:) ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের মহাপরিকল্পনার তিনটি পর্যায়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। এরই মধ্যদিয়ে সে তার সত্য-মাসীহ হবার দাবী এবং পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত ভুয়া-রাষ্ট্র ইসরাঈল থেকে গোটা পৃথিবীর উপর রাজত্ব চালাবার মিশন সম্পন্ন করবে। রাসূল (সা:) বলেছেন, *"যখন দাজ্জাল মুক্ত হবে তখন সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে — একদিন হবে এক বছরের মত, একদিন হবে এক মাসের মত, একদিন হবে এক সপ্তাহের মত এবং তার বাকি দিনগুলি হবে তোমাদের দিনের মত।"* (সহীহ মুসলিম)। তিনি আরো ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন (যা তামিম দারি (রা:)-র হাদীস নামে খ্যাতি লাভ করেছে) যে, দাজ্জালের প্রথম ঘাঁটি হবে আরবদেশ হতে সাগর পথে একমাস দূরত্বে অবস্থিত একটি দ্বীপে যা গুপ্তচরবৃত্তিতে প্রসিদ্ধ। এটাই হবে তার মিশনের প্রথম পর্যায় যার মেয়াদ হবে "*একদিন এক বছরের মত*"। আমি বিশ্বাস করি, ঐ দ্বীপ ব্রিটেন ছাড়া আর কোথাও হতে পারেনা।

বাইবেলেও তিনটি পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে, যার পরিণতিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা চালু হবে এবং মাসীহ-শত্রু (Anti-Christ) জেরুযালেম হতে সারা বিশ্বের উপর শাসন করবে।

". . . সে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, স্বাধীন ও গোলাম, সকলকেই ডান হাতে বা কপালের উপর একটা চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করল। ফলে সেই চিহ্ন ছাড়া কেউ কিছু কিনতে বা বিক্রি করতে পারল না। সেই চিহ্ন হলো সেই জন্তুটার নাম বা নামের সংখ্যা। এই সব বুঝতে বুদ্ধির দরকার। যার বুদ্ধি আছে সে সেই জন্তুটার সংখ্যা গুণে দেখুক, কারণ ওটা একটা মানুষের নামের সংখ্যা। আর সেই সংখ্যা হলো ছ'শো, তিন-কুড়ি আর ছয়।"

— বাইবেলের নতুন নিয়ম, রেভেলেশন, ১৩:১৬-১৮

বাইবেলের ধর্মীয় প্রতীকের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, *ছ'শো* সংখ্যাটির ইশারা মাসীহ-শত্রুর মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের দিকে রয়েছে, যার মেয়াদ অনেক লম্বা

হবে, এবং যা বাইবেল-পরবর্তী যুগের প্রথম বিশ্ব-শাসক অর্থাৎ ব্রিটেনকে চিহ্নিত করে। *তিন-কুড়ি* সংখ্যাটির ইশারা বর্তমান দ্বিতীয় পর্যায়ের দিকে রয়েছে, যার মেয়াদ বেশ কম হবে, এবং যা দ্বিতীয় বিশ্ব-শাসক অর্থাৎ আমেরিকাকে চিহ্নিত করে। সর্বশেষে *ছয়* সংখ্যাটি সেই মহাপরিকল্পনার সর্বশেষ স্তরকে চিহ্নিত করে, যখন মাসীহ-শত্রু মানুষের আকার ধারণ করে সামনে আসবে এবং ভুয়া ইহুদি-রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র জেরুযালেম হতে সমগ্র বিশ্বকে শাসন করবে।

ইউরো-খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের গোড়া থেকেই এই মহাপরিকল্পনার যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে তা হলো খোদাহীনতা, নৈতিক অবক্ষয়, প্রতারণা ও বর্বর অত্যাচার।

৩ § সূরা কাহাফ ও নবী (সা:)-এর সুন্নত

সূরা কাহাফকে কেন্দ্র করে রাসূল (সা:)-এর সুন্নতকে বুঝতে হলে দু'টি ঘটনা খুটিয়ে দেখতে হবে যা মহানবী (সা:)-এর জীবদ্দশায় সংগঠিত হয়েছিল এবং তাঁর সাহাবীরাও তাতে জড়িত ছিলেন।

প্রথম ঘটনা

প্রথম ঘটনাটি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূল (সা:) তাঁর এক সাহাবী আব্বাদ বিন বিশ্‌র (রা:)-কে গোটা সূরাটি মুখস্থ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

মহানবী (সা:) এই আদেশটি যদি একজনকেও দিয়ে থাকেন, তাহলেও এটিকে নবীর সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এটি আমাদের ঐকান্তিক আশা ও প্রার্থনা যে, এই বর্ণনা আমাদের পাঠকদেরকে সুন্নতটি আনন্দের সাথে পালন করার উৎসাহ যোগাবে, এবং তারা সূরাটি মুখস্থ করে যত ঘন ঘন সম্ভব নামাযের মধ্যে এর তেলাওত করবে। এখানে আব্বাদ বিন বিশ্‌র (রা:)-র সেই ঘটনার বর্ণনাটি দেয়া হলো:

শান্তভাবে আব্বাদ (রা:) তার শরীর থেকে তীরটি বের করে ফেলল এবং তার নামাযের মধ্যে তেলাওত চালিয়ে গেল। আক্রমণকারী দ্বিতীয় ও তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করল যা আব্বাদকে আঘাত করল। আব্বাদ সেগুলিকে এক এক করে বের করে ফেলল। সে তেলাওত শেষ করে রুকু ও সেজদাহ করল। দুর্বল ও ব্যাথায় কাতর অবস্থায় সে ডান হাত বাড়িয়ে তার ঘুমন্ত সাথী আম্মার (রা:)-কে জাগাল। আম্মার (রা:) জেগে উঠল। নিঃশব্দে আব্বাদ তার নামায চালিয়ে গেল। নামায শেষ করে সে বলল, উঠ আর আমার জায়গায় দাড়িয়ে পাহারা দাও, আমি আহত হয়েছি।

আম্মার লাফ দিয়ে উঠল এবং চিৎকার দেয়া শুরু করল। তাদের দুজনকে দেখে আক্রমণকারী অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেল। আম্মার মাটিতে শায়িত আব্বাদের দিকে মনোযোগ দিল। তার ক্ষত থেকে তখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

"ইয়া সুবহানাল্লাহ, যখন তোমাকে প্রথম তীরটি আঘাত করেছিল, তখন তুমি আমাকে কেন জাগিয়ে তোলো নি?"

"আমি তখন কুর'আনের এমন আয়াতগুলি পড়ছিলাম যা আমার আত্মাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাই আমি তেলাওত বন্ধ করতে চাইনি। মহানবী (সা:) আমাকে আদেশ করেছেন এই সূরাটি মুখস্থ করতে। আমার পক্ষে এর তেলাওত থামানোর চেয়ে মৃত্যু বরণ করা সহজ ছিল।" তার সাথীর প্রশ্নের উত্তরে আব্বাদ এই কথাগুলি বলল।

— খালিদ মুহাম্মদ খালিদ: Men around the Messenger "রাসুলের আশেপাশে লোকসকল" Islamic Book Trust Kuala Lumpur (www.ibtbooks.com) ২০০৫, পৃ-৪৪০

যদি রাসূল (সা:) কোন এক সাহাবীকে কুর'আনের একটি সূরা মুখস্থ করার জন্য আদেশ করেছেন, তার অর্থ এই নয় যে আদেশটি সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য-পালনীয়, তবে এটি অবশ্যই একটি সুন্নত। উপরের বর্ণনা অনুযায়ী, এবং যে বর্ণনা সামনে আসছে, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে সূরা কাহাফ মুখস্থ করা সুন্নত। অতএব যদি কেউ একটি সুন্নত পালন করে, এবং আল্লাহ্ সেটিকে গ্রহণ করেন, তাহলে সে নিশ্চয় পুরস্কৃত হবে।

এই লেখক সূরা কাহাফ মুখস্থ করেছেন যখন তিনি ১৪২৪ হিজরীতে রমজান মাসে এতেকাফ অবস্থায় এই বইটি লিখছিলেন। তিনি এই কাজে এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করেছিলেন যা দুনিয়ার অন্য কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি আব্বাদ বিন বিশ্‌র (রা:)-র অনুকরণে নামাযের মধ্যে প্রথমবারের মত গোটা সূরাটি তেলাওত করেছিলেন। লেখকের প্রর্থনা যে, যারা এই বইটি পড়বেন তারাও অনুরূপভাবে উৎসাহিত হয়ে এই সূরাটি মুখস্থ করে নামাযের মধ্যে এটিকে তেলাওত করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

দ্বিতীয় ঘটনা

সূরা কাহাফ তেলাওতের দ্বিতীয় ঘটনাটিতেও রাসূল (সা:)-এর আরেক সাহাবী জড়িত ছিলেন, যার বর্ণনা সহীহ বুখারীতে রয়েছে। বর্ণনা মতে একজন সাহাবী সূরা কাহাফের তেলাওত করার সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বর্গীয় *সাকীনা* বা হৃদয়ের শান্তি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন, যা আসমান হতে মেঘের মত নেমে এসেছিল, এবং যার কারণে তাঁর ঘোড়া ভয় পেয়েছিল। হাদীসে অবশ্য বলা নেই যে, তাঁর এই সাকীনা প্রাপ্তি কুর'আনের কোন নির্দিষ্ট সূরার তেলাওতের জন্য হয়েছিল, নাকি (সূরার নামের উল্লেখ ব্যতীত) কেবল মাত্র কুর'আন তেলাওতের জন্য হয়েছিল। আমাদের মতে, এখানে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে।

বারা বিন 'আযিব (রা:) হতে বর্ণিত: "এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তেলাওত করছিলেন, এবং তাঁর পাশে দড়ি দিয়ে তাঁর ঘোড়াটি বাঁধা ছিল। এক খন্ড মেঘ নীচে নেমে এসে তাঁকে ঢেকে ফেলল এবং এত কাছে আসতে থাকল যে তাঁর ঘোড়াটি ভয়ে লাফাতে শুরু করল। যখন সকাল হলো তখন সেই ব্যক্তি রাসূল (সা:)-এর নিকটে গিয়ে এই অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে জানালেন। রাসূল (সা:) বললেন, এটা ছিল সাকীনা (মনের শান্তি) যা কুর'আন তেলাওতের কারণে নেমে এসেছিল।"

— সহীহ বুখারী

নবী (সা:) এবং সূরা কাহাফ

উপরের এই চমৎকার বর্ণনা থেকেও আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে সূরা কাহাফ মুখস্থ করা সুন্নত। নবী (সা:) তাঁর নিজেরই সূরা কাহাফ মুখস্থ করাকে এভাবে স্মরণ করেছেন:

আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা:) বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ, মরিয়াম, তা-হা এবং আম্বিয়া প্রথম সূরাগুলির অন্যতম যা আমি মুখস্থ করেছিলাম এবং এগুলি আমার প্রথম সম্পদ।"

— সহীহ বুখারী

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা:) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা:) বলেছেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ, মরিয়াম, তা-হা এবং আম্বিয়া আমার প্রথম উপার্জনের মধ্যে অন্যতম এবং আমার পুরাতন সম্পদ . . .।"

— সহীহ বুখারী

এখন আমরা সূরা কাহাফের সেই পরিচয় পর্বে ফিরে যাই যেখানে বলা হয়েছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সা:) জুম্মার দিন বিশ্বাসীদেরকে এই সূরাটির তেলাওত করতে বলেছেন, কারণ এই সূরার নূর (আলো) ভুয়া-মাসীহ দাজ্জালের ফেৎনা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।

আবু সাঈদ (রা:) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা:) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি জুম্মার দিন সূরা কাহাফের তেলাওত করে তাহলে তার জন্য একটি আলো পরবর্তী জুম্মা পর্যন্ত উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেবে।"

— তিরমিযী এবং বায়হাকির *কিতাব আল-দা' ওয়া আল-কাবীর*

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত: "নবী (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম্মার দিন সূরা কাহাফের তেলাওত করে, এর আলো তাকে পরবর্তী জুম্মা পর্যন্ত উদ্দীপিত রাখবে।"

— নাসাঈ, বায়হাকি, হাকিম

ইবনে ওমর (রা:) হতে বর্ণিত: "নবী (সা:) বলেছেন: যে ব্যক্তি জুম্মার দিন সূরা কাহাফের তেলাওত করবে সে একটা আলোর দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে যে আলো তার পদতল থেকে আকাশের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছবে। এটি তার জন্য শেষ বিচারের দিনের আলো হবে, এবং সে দুই জুম্মার মাঝখানে যা কিছু করেছে তার জন্য তাকে মাফ করে দেয়া হবে।"

— (সৈয়দ সাকিব: *ফিকহ-আস-সুন্নাহ*-য় বলা আছে যে এই হাদীসটি ইবনে মারদাবিয়া থেকে নির্ভরযোগ্য সুত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে)

সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনের জন্য 'ফ্রাইডে' বা 'শুক্রবার' নামটি ব্যবহার না করে আমরা কুর'আনে ব্যবহৃত 'ইয়াওমুল জুম্মা' নামটি ব্যবহার করাকে বেশী পছন্দ করি। যদিও 'ফ্রাইডে' নামটি ইউরোপের এক পোপের স্বীকৃতি পেয়েছে, তবুও এর পৌত্তলিক উৎসকে

অগ্রাহ্য করা যায় না। 'ফ্রাইডে' শব্দটি পৌত্তলিকদের দেবী 'ফ্রিয়া', ও 'ডায়েগ' অর্থাৎ দিনের সমষ্টি। সুতরাং 'ফ্রাইডে' মানে দেবী 'ফ্রিয়ার দিন'। *এনকার্টা* বিশ্বকোষে 'ফ্রাইডে' সম্পর্কে রয়েছে:

[*ফ্রাইডে* (এ্যাংলো-স্যাকসন Frigedaeg এসেছে পুরাতন জার্মান Fria দেবী, এবং পুরাতন ইংলিশ daeg বা day থেকে)। এটি হচ্ছে সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনের ইংরেজি নাম। দিনটিকে ভালোবাসার দেবী Venus পবিত্র মনে করত। রোমানরা দিনটিকে Dies Veneris অর্থাৎ 'ভিনাসের দিন' বলে জানত। প্রেমের ভাষাগুলিতে এই ল্যাটিন শব্দটি বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যেমন ফরাসী ভাষায় Vendredi, ইতালীয় ভাষায় Venera এবং স্পেনিস ভাষায় Viernes। জার্মানরা দিনটিকে Norse ভালবাসার দেবী Frigg বা Frija-র জন্য পবিত্র মনে করত। ইংরেজির মত জার্মান ভাষাগুলিতেও এই দিনটির নামকরণ হয়েছে পুরাতন উচ্চ জার্মান Friatag (day of Frija) থেকে। ফ্রাইডের হিব্রু নাম হলো *ইয়াওম শিশি* অর্থাৎ ষষ্ঠ দিন। স্লাভদের অনেকে কিন্তু ফ্রাইডেকে সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন মনে করে না। যেমন দেখা যায় রুশ ভাষায়, যেখানে এর নাম হলো পিয়াটনিতজা (Pyatneetza) অথবা পঞ্চম দিন।]

সুতরাং সূরা কাহাফকে শুধু মুখস্থ করাই সুন্নত নয় বরং প্রতি ইয়ামুল জুম্মার দিন তেলাওত করাও সুন্নত। আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে এই বইয়ের সকল পাঠক সূরাটি মুখস্থ করবেন ও প্রত্যেক জুম্মার দিন নিষ্ঠার সাথে তেলাওত করবেন।

নবী (সা:) আরও বলেছেন যদি দাজ্জাল কোন ব্যক্তির মুখোমুখি হয়, তাহলে তার উচিত হবে দাজ্জালের উপর সূরাটির প্রথম দশটি আয়াতের তেলাওত করা, তাহলে দাজ্জাল তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আবু দারদা (রা:) হতে বর্ণিত: "রাসূল (সা:) বলেছেন: যদি কোন ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে তাহলে সে দাজ্জালের কাছ থেকে রক্ষা পাবে।" (আমরা এই বইয়ের পরবর্তী এক অধ্যায়ে সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াতের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ সংযোগ করেছি)।

— সহীহ মুসলিম

"তোমাদের মধ্যে যে দাজ্জালকে দেখতে পাবে তার উচিত হবে দাজ্জালের উপর সূরা কাহাফের প্রারম্ভিক আয়াতগুলির তেলাওত করা।"

— সহীহ মুসলিম

আবু দারদা (রা:) থেকে বর্ণিত: "রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিনটি আয়াতের তেলাওত করে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবে।"

— তিরমিযী

এই সূরাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা পাঠকদেরকে খ্রিষ্ট-শত্রু বা দাজ্জালের বিষয়টির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ইসলামে একে ভুয়া-মাসীহ বলা হয়।

দাজ্জাল সম্পর্কে যে প্রথম কথাটি আমরা জানি তা এই নাম থেকেই প্রকাশ পায়। নবী (সা:) তাকে *আল-মাসীহ আদ-দাজ্জাল* নামে বর্ণনা করেছেন। যাঁকে মানবজাতির ত্রাণের উদ্দেশ্যে পাঠান হবে তিনি হলেন 'মাসীহ'; আর 'দাজ্জাল' মানে প্রতারক। এভাবে সে ইহুদিদের কাছে প্রতিশ্রুত মাসীহ হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাদেরকে প্রতারিত করবে; আসলে সে হবে একজন ভুয়া মাসীহ।

আল্লাহ্-তা'আলা বনী ইসরাঈলের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাদের মাঝে তিনি একজন বিশেষ নবী পাঠাবেন, যিনি মাসীহ নামে পরিচিত হবেন, এবং যিনি সেই সোনালী যুগ (দাউদ ও সুলায়মান (আ:)-এর যুগ) ফিরিয়ে আনবেন, যে যুগে ইসরাঈলী রাষ্ট্র পবিত্র ভূমি থেকে সারা বিশ্বকে শাসন করত। কুমারী মরিয়মের ছেলে যীশুকে মাসীহ হিসেবে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তার ওয়াদা পূরণ করেছিলেন।

তবে অধিকাংশ ইসরাঈলীরা যীশুকে মাসীহ হিসেবে মেনে নেয়নি। বরং তারা তার মাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং যীশুকে জারজ সন্তান হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। তারা তাকে মাসীহ হিসেবে চিনতে পারেনি। যখন তারা তাকে (অর্থাৎ যীশুকে) শূলে চড়ানোর ষড়যন্ত্র করল এবং দেখল যে জেরুযালেম থেকে পৃথিবীকে শাসন না করেই সে মারা যাচ্ছে, তখন তাদের অস্বীকৃতিটা আরও মজবুত হয়। এছাড়া তাদের চোখের সামনে শূলে চড়ানোর মাধ্যমে তার মৃত্যু তৌরাতের ভাষায় ঈশ্বরের অভিশাপ হিসেবে গণ্য হয়।

এভাবে যীশুকে মিথ্যা মাসীহ মনে করে শূলিবিদ্ধ করার পর ইহুদিরা আজও সত্য মাসীহের অপেক্ষায় রয়েছে, যার মাধ্যমে সেই স্বর্গীয় ওয়াদা পূর্ণ হবে।

যীশুকে অবিশ্বাস করা, তাকে অস্বীকার করা এবং তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করার মাধ্যমে গর্ববোধ করার জবাবে আল্লাহ্ পৃথিবীতে এক বিশেষ সত্তাকে মুক্তি দিয়েছেন যার নাম দাজ্জাল বা মিথ্যা মাসীহ। তার কাজ হবে ইহুদিদের সাথে প্রতারণা করা, যেন তারা তাকে সত্য মাসীহ হিসেবে মেনে নেয়। এভাবে সে তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতারণার মাধ্যমে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করবে। সে কারণে সূরা কাহাফ, ইহুদি সম্প্রদায় ও দাজ্জাল, এই তিনটি বিষয় একই সুত্রে গাঁথা।

দাজ্জালের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে একই সাথে ইয়াজুজ এবং মাজুজ গোষ্ঠির পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার কাহিনীর অবতারণা করতে হয়। কুর'আনে এদেরকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার সাথেও ইহুদিরা জড়িত রয়েছে। এসব বর্ণনার মধ্যে চলে আসে ইমাম মেহ্দী (আ:)-এর আবির্ভাবের কথা, যিনি মুসলিম সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবেন এবং অত্যাচারী ও প্রতারক ইসরাঈল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেবেন। পরিশেষে যীশুর প্রত্যাবর্তনের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া এই বিষয়টি পুরাপুরিভাবে বুঝা যাবে না। তাঁর প্রত্যাবর্তন ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের সমাপ্তি ঘটাবে, ফলে ইসলামের সত্যতার জয় হবে।

এখন তাহলে সূরা কাহাফের অবতীর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পর্যালোচনা করা যাক, কারণ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে ইহুদিদের সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য।

৪ § সূরা কাহাফ অবতীর্ণ হবার ঐতিহাসিক পটভূমি

ইসলামের চ্যালেঞ্জ

রাসূল (সা:)-এর জন্মের শত শত বছর আগে ইসমাঈল (আ:)-এর পর থেকে আল্লাহ্‌র নবীদের সম্পর্কে আরব পৌত্তলিকদের কোন ধারণা ছিল না। ইব্রাহীম (আ:) ও ইসমাঈল (আ:)-এর ধর্ম দূষিত হয়ে গিয়েছিল। তাই আরবরা আল্লাহ্‌র উপাসনার পাশাপাশি মূর্তি পূজাও করত। এভাবে তারা আল্লাহ্‌কে অনেকগুলি দেবতার মধ্যে একজন মনে করত। দীর্ঘদিন কোন স্বর্গীয় বাণী না পাওয়া সত্বেও, এবং কোন নবীর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্বেও, তারা ইব্রাহীম (আ:)-এর ধর্মের কিছু কিছু অংশ ধরে রেখেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ইব্রাহীম (আ:) মক্কাতে কা'বা বা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানে বাৎসরিক হজ্জ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সকল আরববাসী এই পবিত্র ঘরকে সম্মান করত এবং শত শত বছর ধরে ইব্রাহীম (আ:)-এর প্রতিষ্ঠিত হজ্জব্রত পালন করত। কোরাইশ গোত্রকে, যারা নিজেদেরকে ইসমাঈল (আ:)-এর বংশধর বলে মনে করত, সমস্ত আরবরা কা'বাঘরের জিম্মাদার বলে মেনে নিয়েছিল। আর এজন্যে তারা সম্মান, সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার অধিকার লাভ করেছিল। ইব্রাহীম (আ:)-এর প্রকৃত ধর্মের যা কিছু আরব পৌত্তলিকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন আমার লেখা বই: *The Religion of Abraham and the State of Israel – A View from the Qur'an.*

কুরাইশ গোত্রে জন্ম লাভ করে বেড়ে উঠার পর মহানবী (সা:) জানালেন যে তিনিও ইব্রাহীম এবং ইসমাঈলের মত আল্লাহ্‌র এক নবী। তিনি পৌত্তলিক আরবদের দেবতা ও মূর্তির উপাসনা করতে অস্বীকার করলেন। মূর্তিপূজা ও বহু ঈশ্বরবাদকে তিনি নিন্দা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি সেই অদৃশ্য ঈশ্বর, যিনি ইব্রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, মূসা, দাউদ, সুলায়মান ও ঈসা (আ:), সকলেরই প্রভু। তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্‌র কোন কন্যা সন্তান নেই এবং তিনি কোন ছেলে সন্তানের পিতাও নন। তিনি কখনও কারো সামনে উপস্থিত হননি (তা সেটা প্রাচীন মিশর হোক আর ভারত, আরবদেশ হোক আর বেথলেহেম, এমনকি শিকাগোতেও না)। আল্লাহ্ কোন বস্তুর মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করেননি, না কাঠে না মার্বেলে না পাথরে। আল্লাহ্ হলেন সকল মানব জাতির প্রভু; আরব, অনারব, সাদা এবং কালো, সবার প্রভু তিনি। তিনি মক্কাবাসী এবং কুরাইশদের প্রভু, সেই সাথে তিনি অন্যান্য সকল শহর, সকল গোত্র এবং সকল জাতির প্রভু।

মুহাম্মদ (সা:) জানালেন যে চিরুনির দাঁতগুলি যেমন সমান তেমনি সকল মানবজাতি আল্লাহ্‌র কাছে সমান। তিনি সকল স্বাধীন নর-নারী, প্রভু এবং দাসদেরও প্রভু।

মুহাম্মাদ (সা:) সকল প্রকার অত্যাচারের নিন্দা করলেন। বিশেষ করে তিনি দুর্বল, গরীব, অপরিচিত, বিদেশী, দাস, নারী ও শিশুদের প্রতি সকল ধরনের অত্যাচারের নিন্দা জানালেন। তিনি পশু-পাখির প্রতিও নিষ্ঠুরতাকে বারণ করলেন।

তিনি যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করলেন, সেটা আরব সমাজে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠির দাপট ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য এটা ছিল একটা বিশাল হুমকি। একমাত্র ইসলামই আজও পর্যন্ত ঈশ্বরহীন, দূর্নীতিগ্রস্ত, নৈতিকতা-বিবর্জিত ইহুদি-খ্রিষ্টান ইউরোপীয় বিশ্বব্যবস্থার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। ইসলামই একমাত্র শক্তি যা সকল প্রভাবশালী ইউরোপীয় সম্প্রদায় ও তাদের অ-ইউরোপীয় (non-white) দোসরদের নজীরবিহীন বর্বরচিত অত্যাচারের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে।

মুহাম্মদ (সা:)-এর ঘোষণা ও ধর্ম প্রচারে কুরাইশ বংশ আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তিনি তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতি এসকলের চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কুর'আনের ভাষা। আরবরা তাদের সাহিত্যকর্মে গর্ববোধ করত। যদিও অধিকাংশ আরববাসী লিখতে ও পড়তে জানত না, তদুপরি তাদের ভাষা ছিল উন্নতমানের, এবং কবিতার প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল ঈর্ষনীয়। তারা কবিদেরকে সম্মান করত এবং সমাজে তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করত। অতএব মুহাম্মদ (সা:)-এর মুখ থেকে নিসৃত কুর'আনের বাণী তাদের সকল সাহিত্যকর্মকে ম্লান করে দেয়াতে তারা হকচকিয়ে গেল। যে সাহিত্য ক্ষেত্রে আরবরা নিজেদেরকে সবার চাইতে শক্তিশালী মনে করত, সেখানেও কুর'আন তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। এবং তারা এই খোলা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে অক্ষম ছিল। কুর'আন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল, এবং গোটা মানবজাতিকে, যারা এটিকে এক আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে মানতে নারাজ ছিল, এর মত একটি সূরা তৈরী করার আহ্বান জানাল। পৌত্তলিক আরব এর আগে এধরণের কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। অতএব, এটাই ছিল তাদের জন্য এক অপ্রীতিকর অবস্থা।

আরববাসী কিভাবে এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দিবে? তারা কিই বা করতে পারে? তাদের সকল চেষ্টা ইসলামকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ইহুদিদের কাছ থেকে সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নিল। ইহুদিরা তখন উত্তরাঞ্চলীয় শহর ইয়াসরিবে (পরবর্তীতে এর নাম হয় মদীনা) বাস করত। তারা তাদের র‍্যাবাইদেরকে জিজ্ঞেস করল, "ইব্রাহীম ও মুসার মত মুহাম্মদ যে সত্য নবী তা কিভাবে বলব?" ইহুদিদের উত্তরের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্-তা'আলা সূরা কাহাফকে নাজিল করলেন। সূরা কাহাফের সাথে ইয়াসরিবে পাঠান দলের এই সম্পর্ক কুর'আনেই লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেখানে র‍্যাবাইদের দেয়া দু'টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে:

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ . . .

"আর তারা (*অর্থাৎ ইয়াসরিবের র‍্যাবাইরা*) আপনাকে যুলকার্‌নাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৮৩

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . . .

"আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে . . ."

— সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮৫

ইয়াসরিবে পাঠান এই মিশনের ইতিহাস, ইহুদিদের সাথে এই সূরাটির সম্পর্ককে তুলে ধরে। আমরা এবার সেই আলোচনাই করব।

(মদীনায়) ইয়াসরিবে মিশন প্রেরণ

কুরাইশগণ নাদ্‌র বিন হারিস ও উকবা বিন আবু মু'আইতের নেতৃত্বে মক্কা থেকে প্রায় ৩৪০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ইয়াসরিবে (*মদীনাতুন্নাবী*, সংক্ষেপে *মদীনা*) ইহুদি র‍্যাবাইদের সাথে পরামর্শ করার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারা তাদের দলকে বলে দিল যে:

"তাদেরকে মুহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; তাদের কাছে তার বিবরণ দিবে; সে যা বলে তা তাদেরকে জানাবে; কারণ তারাই হচ্ছে সর্বপ্রথম যাদের কাছে আসমানী বই এসেছে, এবং নবীদের সম্পর্কে তাদের যে জ্ঞান আছে তা আমাদের নেই।"

— The Life of Muhammad ইবনে ইসহাকের *সীরাত রাসুলুল্লাহর* অনুবাদ
আলফ্রেড গিয়োম অনুদিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৮২, পৃ-১৩৬

মদীনায় একটি বড় ধরনের ইহুদি সম্প্রদায় ছিল। এটা সবারই জানা ছিল যে তাদের মধ্যে সবসময় একজন নবী বাস করেছে। বস্তুত, মুহাম্মদ (সা:) বলেছিলেন যে মূসা (আ:) থেকে ঈসা (আ:) পর্যন্ত এমন কোন সময় ছিল না যখন ইহুদিদের মধ্যে কোন নবী ছিল না। তাই কুরাইশরা চিন্তা করল যে যেহেতু নবীদের সম্পর্কে ইহুদিদের এত ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে, অতএব তারাই মুহাম্মদ (সা:)-এর নবী হওয়ার দাবীর বৈধতা সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে আরবরাও জানত যে ইহুদিরা ইয়াসরিবে এসেছিল এই প্রত্যাশায় যে সেখানে তাদের মধ্যে একজন নবী আসবে। বস্তুত, অনেক বছর ধরে ইহুদিরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করত (পাহাড়ের চূড়া থেকে তারা চিৎকার করে জানাত): "একজন নবী আসছেন। একজন নবী আসছেন। যখন তিনি আসবেন, তিনি হবেন আমাদের নবী। তিনি আমাদের ক্ষমতাশালী করবেন এবং আমরা আমাদের শত্রুদের উপর জয়লাভ করব।" সর্বোপরি, ইহুদিরা এক বিশেষ নবীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল যার সম্পর্কে তাদের কাছে

স্বর্গীয়ভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, যে তিনি মাসীহ হিসেবে পরিচিত হবেন। যখন তারা তাঁর আগমনের আধ্যাত্মিক নিদর্শন দেখতে পেল, এবং বুঝতে পারল যে তিনি ইয়াসরিবেই আসছেন, তখন তারা স্বাভাবিকভাবে মনে করল যে ইনিই হবেন সেই মাসীহ। আর যদি তিনি মাসীহ নাও হন তাহলেও তিনি হবেন "মুসার মত নবী" যার আসার কথা রয়েছে বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ তিনি হবেন একজন আরব)। অথবা তিনি এলাইজাও হতে পারেন (কুর'আনে যিনি ইলিয়াস নামে পরিচিত)। এলাইজার উম্মত তাকে নির্যাতন করেছিল, ফলে তাঁকে রহস্যজনকভাবে স্বর্গে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সেকারণে এই বিশ্বাসের জন্ম নেয় যে এলাইজা একদিন ফিরে আসবেন:

"তাঁরা কথা বলতে বলতে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা আগুনের রথ ও আগুনের কতকগুলো ঘোড়া এসে তাঁদের দুজনকে আলাদা করে দিল এবং এলাইজা একটা ঘূর্ণিবাতাসে করে ঊর্ধ্বাকাশে চলে গেলেন।"

— বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, ২ বাদশাহ্‌নামা, ২:১১

মালাখির মতে, প্রভু এলাইজাকে জীবিত রেখেছেন নতুন নিয়মের শেষ যুগে বিশেষ মিশনে পাঠাবার জন্য।

— বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, মালাখি, ৪:৫-৬

তবে, বিশ্বাস করা হয় যে এই মিশন মাসীহের আগমনের আগের ঘটনা।

— বাইবেল, নতুন নিয়ম, মথি, ১৭:১০,১২; মার্ক, ৯:১১

কুরাইশ প্রতিনিধিরা ইয়াসরিবের ইহুদি র‍্যাবাইদের কাছে গেল, যারা নিজেরাই একজন নবীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং নবীকে সনাক্ত করার মত উপায় উপকরণ তাদের কাছে ছিল। কী ছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যা দিয়ে ইহুদিরা একজন নবীকে চিনতে পারত? কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে তারা কি উপদেশ দিল?

তিনটি প্রশ্ন

ইয়াসরিবের ইহুদিরা মুহাম্মদ (সা:)-কে তিনটি প্রশ্ন করার জন্য কুরাইশদেরকে উপদেশ দিল:

"তাকে তিনটা বিষয়ে জিজ্ঞেস কর যা আমরা তোমাদেরকে বলে দিব। যদি সে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারে তাহলেই সে একজন প্রকৃত নবী। যদি না দিতে পারে তাহলে সে একজন বদমাশ। কাজেই তার সম্পর্কে তোমরা যা মনে কর তা করতে পার:

তাকে জিজ্ঞেস কর সেই যুবকদের কি হলো যারা প্রাচীনকালে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের সম্বন্ধে একটা সুন্দর কাহিনী রয়েছে।

তাকে সেই পরাক্রমশালী পর্যটকের কথা জিজ্ঞেস কর, যে পূর্ব ও পশ্চিম সীমানার কাছাকাছি পৌঁছেছিল।

তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।

যদি সে এগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে তাকে মেনে চল, কেননা সে একজন নবী। যদি সে উত্তর দিতে না পারে তাহলে সে একজন প্রতারক, অতএব তার সাথে যা ভাল মনে কর তাই কর।"

— ইবনে ইসহাক, সিরাত রাসুলুল্লাহ,
অনুবাদ - আলফ্রেড গিয়োম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস,
করাচি, ১৯৬৭ পৃ-১৩৬

ইহুদি র‍্যাবাইগণ মুহাম্মদ (সা:) কি উত্তর দেন সে ব্যাপারে নিশ্চয় আগ্রহী ছিল। তারা সত্যিই সেই তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিল। তারা সত্যিই অবাক হয়ে যেত যদি দেখত তিনি একজন প্রকৃত নবী, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে নবুয়তের অধিকার একান্ত তাদেরই ছিল। তারা এখনও বিশ্বাস করে যে ইব্রাহীম (আ:)-এর পর ইহুদিদের বাইরে আর কেউ নবী হিসেবে আসবে না। তাহলে, কেন এমন হলো?

যদিও ইসমাঈল (আ:) ইব্রাহীম (আ:)-এরই ছেলে, তথাপি তৌরাতকে পরিবর্তন করে তারা দাবী করল যে সে ছিল মানুষের চেহারায় এক বন্য গর্দভ, এবং আল্লাহ্-তা'আলা ইব্রাহীম (আ:)-এর বংশধরদের সম্পর্কে যে কথা দিয়েছিলেন তাতে ইসমাঈলকে অংশীদার করেন নি। এভাবে তৌরাতের পুনর্লিখনের কারণে তারা ইসমাঈল (আ:)-এর বীজ থেকে কোন নবীর আবির্ভাবকে অসম্ভব মনে করত। (দেখুন আমাদের বই: The Religion of Abraham and the State of Israel - A View from the Quran)। অপর দিকে মুহাম্মদ (সা:) ছিলেন আরবীয় এবং ইসমাঈল (আ:)-এর বংশধর। তবুও এব্যাপারে তাদের আগ্রহ থেকেই গেল। তাছাড়া তারা জানত যে, তিনি উত্তর দেবার পর কুরাইশ তো তাদের কাছেই ফিরে যাবে তাঁর কথাগুলির সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য।

অবশেষে প্রশ্নগুলির উত্তর সরাসরি কুর'আনেই দেয়া হলো। তবে অবাকের কথা এই যে সহীহ বুখারীতে দেখা যাচ্ছে র‍্যাবাইরা সাধারণ ইহুদিদের কাছ থেকে উত্তরগুলি গোপন রাখল, এবং তাদের অনেকেই এব্যাপারে অজ্ঞই থেকে গেল। কয়েক বছর পরে যখন মুহাম্মদ (সা:) মদীনায় হিজরত করেন, তখন কিছু ইহুদি তাঁর কাছে আসল এবং তাঁকে রূহ সম্পর্কে সেই তৃতীয় প্রশ্নটি আবার করল। তিনি পবিত্র কুর'আন থেকে সেই অংশটি তেলাওত করে শুনালেন যা আল্লাহ্-তা'আলা অনেক আগেই নাজিল করেছিলেন। অবশ্য হাদীসে এই ঘটনাটি পড়লে মনে হয় যেন এই আয়াতটি ঐসময় অর্থাৎ মদীনায় নাজিল হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত: যখন আমি নবী (সা:)-এর সাথে মদীনার ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি একটা খেজুর গাছের জড়ো করা পাতার উপর হেলান দিয়ে বসলেন। কিছু ইহুদি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা একে অন্যকে বলল: তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তাদের মধ্যে থেকে আরেকজন বলল, তাকে এই প্রশ্ন করা উচিত হবে না কারণ সে এমন এক উত্তর দিবে যা আমাদেরকে অসন্তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু অন্যেরা জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে পিড়াপিড়ি করতে লাগল। কাজেই একজন দাঁড়াল এবং জিজ্ঞেস করল: হে আবুল কাশিম! রূহ কি? নবী (সা:) নীরব রইলেন। আমি মনে করলাম তাঁর কাছে হয়ত দৈববাণী আসছে, তাই আমি নড়লাম না। তারপর নবী (সা:) তেলাওত করলেন:

"আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশ (সম্পর্কিত একটি বিষয়)। আর এবিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮৫)।

— সহীহ বুখারী

এই হাদীসটি মনে হয় দ্বিধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গড়া। ইবনে ইসহাক এই একই ঘটনাকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে যখন নবী (সা:) মদীনায় পৌঁছলেন তখন মদীনার ইহুদি র‍্যাবাইরা নিজেরাই তাঁর কাছে এসে এই প্রশ্ন করে:

আমাকে ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন নবী (সা:) মদীনায় এলেন, তখন ইহুদি র‍্যাবাইগণ তাকে প্রশ্ন করল: "তুমি যখন বলেছিলে, এবিষয়ে তোমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, তুমি কী আমাদেরকে বলছিলে, না তোমার নিজের লোকদেরকে বলছিলে? তিনি বললেন, "তোমাদের উভয়কেই"।

— ইবনে ইসহাক, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ:১৩৯

ইহুদি র‍্যাবাইগণ নবী (সা:)-কে আত্মা সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, সেটা তাঁর আগে (অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানকালে) দেয়া উত্তরের প্রেক্ষিতে ছিল। এতেই প্রমাণিত হয় যে এই প্রশ্নগুলির উত্তর নবী (সা:) মদীনায় পৌছানোর পূর্বেই পেয়েছিলেন।

প্রতিনিধিগণ মক্কায় ফিরে আসলে কুরাইশগণ নবী (সা:)-কে তিনটি প্রশ্ন ছুড়ে দেয় এবং তিনি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন তাহলে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নবী (সা:) বললেন যে তিনি পরের দিন প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন। কিন্তু তিনি "ইনশা'আল্লাহ্" বলতে ভুলে গেলেন।

— ইবনে ইসহাক, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ:১৩৬

এটা হতে পারে যে আল্লাহ্-তা'আলা তাকে ইনশা'আল্লাহ্ বলতে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে "ইনশা'আল্লাহ্" সূরা কাহাফে তো বটেই, আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কি সেই গুরুত্ব?

আমাদের মনে হয় আল্লাহ্ এমন একটা যুগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যখন "ইনশা'আল্লাহ্" (যদি আল্লাহ্ চান) ইত্যাদি পবিত্র পরিভাষা আধুনিক কথাবার্তা থেকে বিলীন হয়ে যাবে। তখন এটাও একটা নিদর্শন হয়ে দাড়াবে যা দ্বারা বিশ্বাসীরা বুঝতে পারবে যে কঠিন পরীক্ষার সময় এসে গেছে। এই বইয়ে সেই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে যে, ইনশা'আল্লাহ্ আধুনিক ভাষার শব্দ ভান্ডার থেকে দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

যখন কুরাইশগণ উত্তর জানার জন্য পরের দিন মুহাম্মদ (সা:)-এর কাছে হাজির হলো, তিনি উত্তর দিতে পারলেন না, কারণ জিব্রাইল (আ:) তাঁর কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসেন নি। এই পরিস্থিতি বেশ কয়েক দিন ধরে চলতে থাকল, এবং একদিকে এটা মুসলমানদের জন্য তীব্র উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল, আর অপর দিকে কুরাইশদের কাছে আনন্দ উল্লাসের বিষয়ে পরিণত হলো। প্রকৃতপক্ষে, জিব্রাইল (আ:) প্রায় দুই সপ্তাহ তার কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসেন নাই। তারপর, আল্লাহ্-তা'আলা সূরা কাহাফকে নাযিল করার মাধ্যমে প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠিয়ে দেন। ইবনে ইসহাক নিম্নোক্ত ভাষায় এই বিষয়ে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করেছেন:

"নবী (সা:)-এর কাছে ওহি আসতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি খুবই বিষন্ন হলেন। তারপর জিব্রাইল (আ:) সূরা কাহাফ নিয়ে এলেন, যেখানে তাঁকে বিষন্ন হবার জন্য নিন্দা করা হলো, প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়া হলো, সেই যুবকদের কথা, সেই পরাক্রমশালী পর্যটকের কথা এবং আত্মার কথা বলা হলো।"

— ইবনে ইসহাক, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ:১৩৭

তিনটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টির উত্তর সূরা কাহাফে দেওয়া হয়েছে, এবং রূহ সংক্রান্ত তৃতীয় উত্তরটি সূরা বনী ইসরাঈলে (সূরা নং ১৭) দেয়া হয়েছে।

বিখ্যাত ইসলামি পন্ডিত মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী (রা:) রূহের প্রশ্নটি ঐ তিনটা প্রশ্ন থেকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর মতে তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল খিযির (আ:)-কে কেন্দ্র করে, যার সাথে মূসা (আ:)-এর রহস্যজনক সাক্ষাতের কথা সূরা কাহাফে বর্ণনা করা হয়েছে:

"এই সূরাটি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা মক্কার পৌত্তলিকরা আহ্‌লে কিতাবদের পরামর্শে নবী (সা:)-কে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল। এগুলি ছিল: গুহার মধ্যে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা কারা ছিল? খিযিরের আসল গল্পটা কি? যুলকার্‌নাইন সম্পর্কে তুমি কি জান?"

— মওদুদী, *তাফহিমুল কুর'আনের* ইংরেজি অনুবাদ: Introduction to Surah Al-Kahf

মনে হয় যে, বিজ্ঞ মাওলানা এই তিনটি প্রশ্নের সবটিরই উত্তর সূরা কাহাফে পেতে চেয়েছিলেন, সেকারণেই তিনি তৃতীয় প্রশ্নটিতে রূহের বদলে মূসা (আ:) ও খিযিরের বিষয়টিকে স্থান দেন। মাওলানা মওদুদীর এই উক্তিটি সমস্যা-সংকুল, কেননা ইহুদি র‍্যাবাইরা খিযির সম্পর্কে জ্ঞানকে নবুয়তের চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করবে, তা অনেকটা অবাস্তব। বস্তুতঃ খিযির প্রমাণ করেছিলেন যে, মূসা (আ:) গল্পে বর্ণিত তিনটি ঘটনার কোনটাকেই সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি, যদিও ইহুদিরা তাঁকে তাদের শ্রেষ্ঠ নবী মনে করত। ইহুদিরা যদি খিযির (আ:)-কে নবুয়তের প্রমাণ মনে করত তাহলে তারা তার খোঁজে বেরুত, কারণ তাকে স্বর্গীয়ভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল। সেটা না করে তারা সবসময় তৌরাত থেকে উদ্ভুত বাহ্যিক আইনের জ্ঞানের পেছনে ছুটেছে যা তাদের মতে সফলতার জন্য এবং বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট। অতএব, মাওলানা মওদুদীর দাবির সাথে আমরা একমত নই।

আসল কথাটি হচ্ছে আল্লাহ্-তা'আলা দু'টি প্রশ্নের উত্তর সূরা কাহাফে এবং তৃতীয়টির উত্তর সূরা বনী ইসরাঈলে দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে কুর'আনের এই দু'টি সূরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং এগুলিকে একসাথে অধ্যয়ন করতে হবে। তাদের একটি অপরটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। আমরা দেখেছি যে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রত্যেক জুম্মার দিন সূরা কাহাফ পড়তে হবে। সে-ই প্রতারণার মাধ্যমে ইহুদিদেরকে চরম ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে। আমরা আরো দেখেছি যে সূরা কাহাফ নাজিল হয়েছিল ইহুদিদের তিনটি প্রশ্নের উত্তরে, যে প্রশ্নগুলি তারা পৌত্তলিক আরবদের হাতে তুলে দিয়েছিল নবুয়তের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তাদেরই অনুরোধে এই প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল, এটা দেখার জন্য যে রাসুলুল্লাহ্ (সা:) সত্যিই নবী ছিলেন কিনা। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে সূরা কাহাফকে কুর'আনের সেই সূরার সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে যার নামকরণ করা হয়েছে ইহুদিদের নামে। বস্তুতঃ, এটাই হলো সূরা কাহাফ এবং ইহুদিদের মধ্যে তৃতীয় যোগসুত্র।

মদীনার ইহুদি র‍্যাবাইরা ঘোষণা দিল যে, মুহাম্মদ (সা:) যদি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তাহলে তারা তাঁকে ইব্রাহীমের প্রভুর একজন সত্যিকারের নবী হিসেবে মেনে নিবে। শুধুমাত্র একজন সত্যিকার নবীরই এই ধরনের জ্ঞান থাকতে পারে। র‍্যাবাইদের সেই জ্ঞান ছিল, কারণ তাদের কাছে ধারাবাহিক ভাবে বহু নবীর আগমন ঘটেছে। তারা আত্মবিশ্বাসী ছিল যে তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবেন না, কাজেই একজন নিরক্ষর অ-ইহুদিকে ইব্রাহীমের প্রভুর নবী হিসেবে মেনে নেয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

প্রশ্নগুলি একটু খুটিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে র‍্যাবাইগণ প্রশ্নগুলির সহজ সরল উত্তরে আগ্রহী ছিল না। বরং তারা এই প্রশ্নগুলির পেছনে প্রকৃত প্রশ্নগুলি লুকিয়ে রেখেছিল। সেই প্রকৃত প্রশ্নগুলি কী ছিল?

আমরা বিশ্বাস করি যে, র‍্যাবাইগণ কৌশলে জানতে চেয়েছিল নবী মুহাম্মদ (সা:) ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জাল সম্পর্কে জানতেন কিনা। এরা হলো আল্লাহ্-তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর। এদেরকে তিনি শেষ যুগে পৃথিবীতে মুক্ত করে দেবেন। তিনি এদেরকে ব্যবহার করবেন মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য ও শাস্তিদানের জন্য। এই পরীক্ষায় কেবলমাত্র তারাই সফল হবে এবং বেঁচে যাবে যারা ইব্রাহীম (আ:)-এর ধর্মকে বিশ্বাস করবে আর মুহাম্মদ (সা:)-কে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করবে। বাকি মানবজাতি প্রতারিত হবে অথবা ঈমান হারাবে। মূলতঃ এক স্রষ্ঠাবিমুখ বিশ্বসমাজ শেষ যুগের 'বিশ্বায়নের' কবলে পড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। নবী (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন যে ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৯৯৯ জনকে তাদের ফটোকপিতে পরিণত করবে এবং তারা সবাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী)।

দাজ্জাল সম্পর্কে সরাসরি জিজ্ঞেস না করে র‍্যাবাইগণ প্রশ্ন করে প্রাচীনকালের কিছু যুবক সম্পর্কে যারা একটি গুহায় পালিয়েছিল এবং যাদের একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে সরাসরি জিজ্ঞেস না করে তারা প্রশ্ন করে একজন মহান পর্যটক সম্পর্কে যিনি পৃথিবীর দুই সীমান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। রূহ সম্পর্কিত তৃতীয় প্রশ্নটি কৌশলগত দিক থেকে ভিন্ন ছিল। এটা ছিল সরাসরি এক প্রশ্ন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

তিনটি প্রশ্নের উত্তর

রূহ

রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নটি ছিল চালাকিপূর্ণ। মানুষের আত্মাকে রূহ বলা হয়। আবার জিব্রাঈল ফেরেশতাকে *রূহ আল-কুদ্দুস* বলা হয়। ঠিক তেমনি, যখন আল্লাহ্ বললেন যে তিনি মানুষের মধ্যে তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন, তিনি বুঝাতে চাইলেন যে তিনিই ঐশ্বরিক আত্মার অধিকারী। এখন দেখা যাক, আল্লাহ্-তা'আলা কুর'আনে তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর কিভাবে দিয়েছেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"আর তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশ (সম্পর্কিত একটি বিষয়)। আর এবিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"

— সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮৫

যেহেতু প্রশ্নটি সরাসরি ছিল, অনুরূপ ভাবে উত্তরটিও ছিল সরাসরি। তবে উপরে উল্লিখিত তিনটি সম্ভাবনাকেই সংক্ষিপ্তভাবে এই উত্তরের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছিল। বলতে হয় যে, প্রশ্নটি এক বাক্যে খারিজ করে দেওয়া হয়। উত্তরটি মদীনার ইহুদিদের কাছে

পৌঁছল, এবং যখন নবী (সা:) নিজে মদীনায় হিজরত করলেন তখন ইহুদিরা তাঁকে এই উত্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তারা জানতে চাচ্ছিল "এবিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে" কথাটি কাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে; ইহুদিদেরকে, নাকি আরবদেরকে; যাদেরকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছিল? নবী (সা:) উত্তরে বললেন: উভয় দলকে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, উপরের উত্তরটি আল্লাহ্‌র হুকুমে সূরা বনী ইসরাঈলের অন্তর্গত করা হয়েছে। বাকি দু'টি প্রশ্নের উত্তর, আবারও আল্লাহ্‌র হুকুমে, পরবর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা কাহাফের অন্তর্গত করা হয়েছে।

রূহের প্রশ্ন এবং বাকি দুটা প্রশ্নের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র অজানা ছিল না। দু'টি সূরার মধ্যে উত্তরগুলিকে ভাগ করে দিয়ে ইহুদি তথা অন্য সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে এর মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। কী সেই পার্থক্য?

মহান পর্যটক

সেই পর্যটক সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সূরাটি তার নাম, অর্থাৎ যুলকার্‌নাইন, দিয়ে শুরু করল। তারপর প্রশ্ন অনুযায়ী শুধু যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তার ভ্রমণের বর্ণনা দিল তাই নয়, প্রশ্নের মধ্যে লুকানো উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজের বিষয়টিকেও সামনে নিয়ে এল। ফলে যুলকার্‌নাইনের তৃতীয় ভ্রমণের কাহিনীও বর্ণনার মধ্যে চলে এল, যে ব্যাপারে র‍্যাবাইরা সতর্কতার সাথে নিশ্চুপ ছিল। এটি একেবারে পরিষ্কার যে প্রশ্নটির প্রকৃত লক্ষ্যই ছিল ইয়াজুজ ও মাজুজ, যারা কিয়ামতের বড় নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। এটি নিঃসন্দেহে এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্কে একজন নবীই জানতে পারেন। প্রশ্নটি পরোক্ষভাবে সেটাই জানতে চেয়েছিল। শ্রেণী বিবেচনায় প্রশ্নটি অবশ্যই রূহের প্রশ্ন থেকে ভিন্ন ছিল।

গুহার যুবকেরা

এক পর্যায়ে সূরা কাহাফ এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া শুরু করল। প্রশ্নের বাহ্যিক দিকের উত্তর প্রত্যক্ষ ভাবে দেয়া হলো, কিন্তু তার গোপন উদ্দেশ্যকে পরোক্ষভাবে জানানো হলো। বলা বাহুল্য, প্রকৃত প্রশ্নটি ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে ছিল, যার ব্যাপারে শুধুমাত্র নবীরাই জানতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ এটাও হতে পারে যে, এই বিষয়টির মধ্যে কেয়ামতের নিদর্শন নিহিত রয়েছে। অতএব, প্রশ্নটির প্রকৃত লক্ষ্য কী ছিল?

যে যুবকেরা গুহার মধ্যে পলায়ন করেছিল, সূরাটি তাদের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছে। এটাও স্পষ্ট যে নাম উল্লেখ না করেও এই বিবরণে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের বিষয়টি

গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তরটি দাজ্জালের নাম নেয়া থেকে বিরত থেকেছে। তাই র‍্যাবাইগণ অনুমানের জালে আবদ্ধ রইল। আসলে গোটা কুর'আনে তাকে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, যেন ইহুদিরা আত্মতুষ্টি থেকে বেরুতে না পারে। কৌশলের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে, যেমন হেঁয়ালীপূর্ণ প্রশ্ন, তেমনই তার উত্তর।

মহানবী মুহাম্মদ (সা:) মদীনায় হিজরত করার কয়েক বছর পর, দাজ্জাল সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানালেন এবং ইহুদিদেরকে অবাক করে দিলেন এই ঘোষণা দিয়ে যে, সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতের তেলাওত করলে বিশ্বাসীরা দাজ্জালের ভয়ঙ্কর পরীক্ষা থেকে রক্ষা পাবে। প্রথম দশ আয়াতের মধ্যে গুহার যুবকদের কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সা:) আরও জানালেন যে দাজ্জাল একজন ইহুদি হিসাবে আবির্ভূত হবে এবং তাকে ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে মুক্তি দেয়া হয়েছে। একথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি মদীনার এক ইহুদি যুবক *ইবনে সাইয়াদের* প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করলেন, যে হয়ত সে-ই দাজ্জাল ছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়ে কুর'আন বুঝিয়ে দিল যে, যে ব্যক্তি মহাপর্যটক সম্পর্কে সংক্ষেপে তথা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য তথ্য দিতে পেরেছে সে নিশ্চয় গুহার যুবকদের সম্পর্কে প্রশ্নটিরও প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে। উদ্দেশ্য আর কিছুই না, দাজ্জাল।

উত্তরসহ প্রশ্ন তিনটির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা সংক্ষেপে আবার দেখা যাক:

১ম প্রশ্ন: যদিও 'রূহ' বা 'আত্মা' এই প্রশ্নের আপাত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, তবুও প্রশ্নটির মধ্যে চালাকি রয়েছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ্-তা'আলা প্রশ্ন এবং প্রশ্নকারী উভয়েরই উল্লেখ করেছেন- "আর *তারা* তোমায় তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করে . . ." উত্তরটি সূরা বনী ইসরাঈলে দেয়া হয়েছে।

২য় প্রশ্ন: প্রশ্নের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ)-কে গোপন রাখা হয়েছে। একারণে উত্তরও অন্য সূরায় প্রদান করা হয়েছে, আর তা হলো সূরা কাহাফ। আবার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ্-তা'আলা প্রশ্ন এবং প্রশ্নকারী উভয়েরই উল্লেখ করেছেন- "আর *তারা* তোমায় তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করে . . ."।

যদিও প্রশ্নের লক্ষ্য গোপন করা হয়েছিল, তথাপি, আল্লাহ্-তা'আলা এর উত্তর সরাসরি দিয়েছেন এবং ইয়াজুজ ও মাজুজকে সেই গোপন বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, পৃথিবীতে যাদের আবির্ভাব হবে কিয়ামতের একটি বড় নিদর্শন হিসেবে।

৩য় প্রশ্ন: তৃতীয় উত্তরটিও দ্বিতীয় উত্তরের মত সূরা কাহাফে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় দ্বিতীয় প্রশ্নের সাথে এর মিল রয়েছে এবং প্রথম প্রশ্নের সাথে অমিল রয়েছে। অতএব, আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় প্রশ্নের মত তৃতীয় প্রশ্নেরও প্রকৃত লক্ষ্য গোপন করা হয়েছে। সেটা ইয়াজুজ ও মাজুজের মতই আরেক বিষয় ছাড়া আর কী হতে পারে?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ্-তা'আলা প্রশ্নকারী আর প্রশ্ন কোনটারই উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন নাই,"আর তারা আপনাকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করে . . ."। এটি দুর্ঘটনাবশত হতে পারে না। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ্-তা'আলা প্রশ্নের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের উল্লেখ না করেই তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এই কাজটা তিনি রাসূল (সা:)-এর উপর ছেড়ে দেন, যিনি সূরা কাহাফের সাথে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের সম্পর্ককে ব্যক্ত করে গেছেন।

৫ § গুহার যুবকদের কাহিনী

তাকে জিজ্ঞেস করো, যে যুবকেরা প্রাচীন যুগে গায়েব হয়ে গিয়েছিল তাদের কী হলো, কারণ তাদের একটা চমৎকার কাহিনী রয়েছে? এটি ছিল ইহুদি র‍্যাবাইদের করা তিনটি প্রশ্নের একটি। তারা মক্কার কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে জানালো যে যদি মুহাম্মদ (সা:) এই তিনটি প্রশ্নের সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারেন তাহলেই তিনি ইব্রাহীমের প্রভুর সত্যিকারের নবী, কারণ শুধুমাত্র একজন নবীই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন।

তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর আল্লাহ্ নাজিল করলেন। তন্মদ্ধে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর সূরা কাহাফের ৯ থেকে ২৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

নিম্নে মূল আরবীসহ অনুবাদ এবং প্রাথমিকভাবে বুঝার জন্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। গল্পটি ৯ম আয়াতে শুরু হয়ে ২৬তম আয়াতে শেষ হয়েছে। আমাদের মতামত ইট্যালিক্সে দেয়া হয়েছে:

আয়াত-৯

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾

"অথবা তুমি কি মনে কর যে গুহার বাসিন্দারা *(যাদের সম্পর্কে ইহুদি র‍্যাবাইরা প্রশ্ন করেছে)* ও লিখিত ফলক *(যা ওরা হয়ত সাথে নিয়ে গিয়েছিল)* আমাদের নিদর্শনাবলীর *(এই কুর'আনের মত, যা এখন নাজিল করা হচ্ছে, তার)* চেয়ে বেশী বিস্ময়কর?"

আয়াত-১০

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

"যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলল: আমাদের প্রভু! তোমার কাছ থেকে আমাদের অনুগ্রহ প্রদান কর, আর আমাদের কাজ কর্মে *(অর্থাৎ ধর্মবিমুখ সমাজ ইসলামের উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, সেটা থেকে বেরুবার)* সঠিক পথ বাতলে দাও।"

আয়াত-১১ ও ১২

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾
ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

"অতঃপর গুহার ভেতরে বহু বছরের জন্য আমরা তাদের কানে চাপা দিয়ে রাখলাম *(তারা বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল)*। তারপর আমরা তাদেরকে জাগিয়ে তুললাম জানার জন্য যে দুই দলের মধ্যে কারা তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

(প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের অপরিহার্য শিক্ষা হলো, যা এই বর্ণনায় চলে এসেছে, এবং যা এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য তা হলো এই যে, যে 'সময়' কোন মৌলিক বা একমুখী ব্যাপার নয়, বরং তা জটিল এবং বহুমুখী। সময়ের গতি বহুমুখী, যা যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে চলেছে, এবং সময়ের এই পরিক্রমায় শুধু তারাই টিকে থাকবে যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রক্ষা করে ন্যায় কাজ করবে। বাকি সবাই ইতিহাসের আবর্জনায় পরিণত হবে। দেখুন, সূরা 'আস্‌র, ১০৩:১-৩)।"

আয়াত-১৩-১৫

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ۖ
لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

"আমরা তোমার কাছে তাদের সঠিক কাহিনী বর্ণনা করছি; নিঃসন্দেহে এরা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল, *(এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল)*, আর আমরা তাদের সৎ পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর আমরা তাদের হৃদয়ে শক্তি *(এবং সাহস)* বৃদ্ধি করেছিলাম যখন তারা উঠে দাঁড়ালো আর *(একে অন্যকে ধর্মহীন সমাজের প্রতিবাদে)* বলল: আমাদের প্রভু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, আমরা কখনই তাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে ডাকব না *(অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা ছাড়া আর কোন ক্ষমতাকে মানতে রাজি না)*। যদি করে বসি তা অতিশয় গর্হিত হবে *(অর্থাৎ কুফরী হবে)*। আমাদের এই স্বজাতিরা তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য উপাস্যদের গ্রহণ করেছে। এরা কেন তাদের উপাস্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, তার চেয়ে বেশী অন্যায়কারী আর কে? *(যেমন সে হুকুম জারি করে সেক্যুলার শাসকের আইন মেনে চলতে)*।"

আয়াত-১৬

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ
وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

"তোমরা যখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তারা উপাসনা করত সে সব থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় নাও; তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তার করুণা বিস্তার করবেন, এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। *(যুবকেরা একে অপরকে পরামর্শ দিল যে, যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিবে যে শির্‌কের জগত থেকে, এবং আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুর উপাসনা তারা করে সেসব থেকে সরে দাড়াবার সময় এসেছে, তখন আশ্রয়ের জন্য গুহায় চলে যেও। তাহলে আল্লাহ্ তোমার উপর তার দয়া ও করুণা বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার কাজগুলি সহজ করে দিবেন)।"*

আয়াত -১৭

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي
فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّـهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّـهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

"আর সূর্য যখন উদিত হতো তখন তুমি দেখতে পেতে তারা গুহার ভেতরে ডান দিকে হেলে আছে, আর যখন অস্ত যেত তখন বাম পাশ দিয়ে (*সূর্য*) তাদেরকে অতিক্রম করছে, আর তারা গুহার ভেতরে এক বিস্তৃত জায়গায় পড়ে রয়েছে। এসব আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্যতম। যাকে আল্লাহ্ সৎপথে চালান সে-ই সৎপথ প্রাপ্ত, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট হতে দেন তার জন্য তুমি কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।"

আয়াত-১৮

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ
لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

"আর তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল ঘুমন্ত; আর আমরা তাদের পাশ ফিরিয়ে দিতাম ডান দিকে ও বাম দিকে। আর তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহার দ্বারে প্রসারিত করে। তুমি যদি তাদেরকে হঠাৎ দেখতে, তবে তাদের থেকে পেছন ফিরে পলায়নপর হতে, আর তাদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তে।"

আয়াত -১৯ ও ২০

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

"আর এইভাবে আমরা তাদেরকে জাগিয়ে তুললাম যেন তারা তাদের নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন বলল: কতকাল তোমরা অবস্থান করেছিলে? কেউ কেউ বলল: আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। *(যাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাদের)* কেউ কেউ বলল: তোমাদের প্রভু ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। *(যেহেতু তারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিল, তাই বলল)* এখন তোমাদের একজনকে এই রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও, সে তখন দেখুক কোনটা কোনটা ভালো খাবার, আর তা থেকে যেন তোমাদের খাবার নিয়ে আসে। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে চলে এবং তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে জানতে না দেয়। নিঃসন্দেহে তারা যদি

তোমাদের সম্বন্ধে জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে *(বা অপমান করবে, অভিশাপ দিবে, গালিগালাজ করবে)*, অথবা তাদের ধর্মে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফলকাম হবে না।"

আয়াত-২১

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ
فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

"আর এই ভাবে আমরা ওদের সম্বন্ধে মানুষকে জানিয়ে দিলাম, যেন তারাও জানতে পারে যে আল্লাহ্‌র ওয়াদাই সত্য; আর কেয়ামতে *(সেই সাথে ফেৎনা ও কঠিন পরীক্ষার যুগ সম্পর্কে, যখন দাজ্জালকে মুক্ত করে দেয়া হবে)* কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের মধ্যে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিতর্ক করছিল, তখন অনেকে বলল: তাদের উপরে একটি সৌধ নির্মাণ কর, তাদের প্রভু তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। যাদের নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে মত প্রবল ছিল তারা বলল: আমরা নিশ্চয় তাদের উপর একটা মসজিদ বানাব।" *(অতএব, আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ তৈরী করা বা মসজিদ তৈরী করাতে কোন দোষ নেই)।*

আয়াত-২২

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ
فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

"*(ইহুদি র‍্যাবাই ও অন্যান্যদের মুখ থেকে এই কাহিনী শোনার পর)* লোকেরা অচিরেই বলবে: তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থজন ছিল একটা কুকুর। অন্যেরা বলবে: পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠজন ছিল কুকুর; না জেনে আন্দাজ করা আরকি। আরও অন্যেরা বলবে: সাতজন, অষ্টমজন ছিল তাদের কুকুর। তুমি বল *(যখন তারা এবিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করে)*, আমার প্রভু তাদের সংখ্যা ভাল জানেন; অল্প ক'জন ছাড়া অন্যেরা তা জানে না *(সেই অল্প ক'জনের মধ্যে মদীনার ইহুদি র‍্যাবাইরা পড়ে না, যারা এই প্রশ্ন করেছিল)*। সুতরাং সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের সম্বন্ধে বিতর্ক করো না, তাদের সম্বন্ধে ওদের কাউকে জিজ্ঞেস করো না *(কারণ তারা কাহিনীটাকে বিকৃত করে দিয়েছে)*।"

আয়াত-২৩ ও ২৪

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

"আর কোন ব্যাপারে কখনই বলো না: আমি ওটা আগামীকাল করবো, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' এই কথা না বলে; আর যখনই ভুলে যাও *(আর পরে মনে পড়ে, যা রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর বেলায় হয়েছিল)* তোমার প্রভুকে স্মরণ কর; আর বল: হয়তবা আমার প্রভু আমাকে গুহাবাসীর বিবরণের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ব্যাপারে সচেতন করবেন।"

আয়াত-২৫

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

"আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশত বছর, আরও নয় বছর *(৩০০ সৌর বছর ৩০৯ চান্দ্র বছরের সমান)*।"

আয়াত-২৬

قُلِ اللَّـهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ
مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

"বলো: আল্লাহ্ ভালো জানেন কতকাল তারা অবস্থান করেছিল। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর ভাবে দেখেন ও শুনেন। তাকে বাদ দিয়ে তাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই। আর তিনি কাউকেও তার কর্তৃত্বে শরিক করেন না।"

যুবকদের সম্পর্কে সূরা কাহাফে দেয়া এই উত্তর মদীনার ইহুদি র‍্যাবাইদেরকে জানানো হয়েছিল। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ১৪০০ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের জানামতে ইহুদি পন্ডিতগণ এই উত্তর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই।

কুর'আনের সূরা কাহাফে দেয়া উত্তরের উপর মন্তব্য করার জন্য এই বইয়ে গোটা বিশ্বের সকল ইহুদি পন্ডিতদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

গল্পটির সংক্ষিপ্তসার এবং আমাদের যুগের জন্য এর তাৎপর্য

মুহাম্মদ আসাদ সূরাটির উপর মন্তব্য করেছেন এবং তার মন্তব্যে সূরাটি তথা গুহা এবং যুবকদের গল্পটির মূলকথা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা এখানে তার উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যাতে পাঠক তার মূল্যবান কাজের সাথে পরিচিত হতে পারেন এবং তার মন্তব্য ও সমগ্র অনুবাদ থেকে উপকৃত হতে পারেন:

সূরা নাহ্ল (মৌমাছি) অবতীর্ণ হওয়ার কিছু পূর্বে অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ বছরে সূরা কাহাফ অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরাটি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস এবং পার্থিব জীবনের প্রতি মোহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি রূপকের সমষ্টি। সূরাটির মূল বক্তব্য রয়েছে এর ৭ নং আয়াতে, যেখানে বলা হয়েছে: "পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে, সেগুলিকে

ওটার শোভা করেছি মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্যে যে, তাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ।" এই নীতিকথাটি বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে একজন ধনী এবং আরেকজন গরীব মানুষের রূপক কাহিনীর ভেতর দিয়ে (আয়াত নং ৩২-৪৪)।

গুহার লোকদের গল্পটি, যার থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে, ঈমান রক্ষার স্বার্থে পৃথিবীকে বর্জন করার নীতিমালাকে ব্যাখ্যা করে (আয়াত নং ১৩-২০), যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের মর্মকে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করা। মূসা এবং বেনামী সাধকের গল্পে (আয়াত নং ৬০-৮২) আধ্যাত্মিক জাগরণের বিষয়টিকে আরেক ধাপ উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সত্যের সন্ধানে এই গল্পটির নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার সাথে। *আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয় তার সাথে বাস্তবতার মৌলিক পার্থক্য শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অন্তরদৃষ্টির সাহায্যেই উপলব্ধি করা সম্ভব।* সর্বশেষে, যুলকার্‌নাইনের রূপক গল্পটি, যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের কারণে পৃথিবীকে বর্জন করতেই হবে এমনটি নয়। যদি মানুষ তার সকল কাজের পরকালীন ফলাফল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তার দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকে, তাহলে পার্থিব জীবন ও ক্ষমতার সাথে আধ্যাত্মিক ন্যায়পরায়ণতার কোন দ্বন্দ্ব নাই। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্‌ সময় ও আত্মপ্রকাশের ঊর্ধ্বে। সুতরাং সূরাটির শেষ কথাগুলি হলো: "কাজেই যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের এবাদতে কাউকে শরিক না করে।"

গুহার লোকদের সম্পর্কে অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে, এটা ছিল তৃতীয় শতাব্দীতে খ্রিষ্টানদের প্রাথমিক যুগে সম্রাট ডেসিয়াসের অত্যাচারের ঘটনার অংশ। লোককাহিনীতে আছে যে ইফেসাসের কিছু খ্রিষ্টান যুবক তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে তাদের কুকুরকে সাথে নিয়ে একটা নির্জন গুহায় আশ্রয় নিল। সেখানে তারা অলৌকিকভাবে এক লম্বা সময় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকল (এই সূরার ২৫নং আয়াতের বিবরণ অনুযায়ী প্রায় তিন শতাব্দী)। অবশেষে যখন ঘুম থেকে জেগে উঠল, তারা বুঝতে পারল না যে তারা এক দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে ছিল। তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে শহরে পাঠাল কিছু খাবার কেনার জন্য। ইতোমধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল। খ্রিষ্টান ধর্মের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি তা রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ডেসিয়াসের যুগের প্রাচীন মুদ্রা নিয়ে যুবকটি যখন জিনিসের দাম দিতে গেল, তখন সেটা নিয়ে বাজারে কৌতুহল সৃষ্টি হলো। লোকেরা তাকে প্রশ্ন করা শুরু করল, এবং এই ভাবে গুহার লোকদের অলৌকিক ঘুমের গল্প প্রকাশ হয়ে পড়ল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ এই সূরার ৯ থেকে ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় খ্রিষ্টানদের লোককাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন। তবে মনে হয় যে খ্রিষ্টানদের কাহিনীটি আরও পুরাতন কোন কাহিনীর অবলম্বনে গড়ে তোলা, যার উৎস পাওয়া যায় ইহুদিদের ঐতিহ্যে। এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় সহীহ হাদীস থেকে (যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন সকল নামকরা ভাষ্যকারগণ) যেখানে বলা হয়েছে মদীনার ইহুদি র‍্যাবাইগণ

মুহাম্মদ (সা:)-এর বিরুদ্ধবাদী মক্কাবাসীদেরকে তাঁর নবুয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন বলে দিয়েছিল, যার মধ্যে গুহার যুবকদের কাহিনীও সামিল করা হয়েছিল। এই হাদীসগুলির দিকে ইঙ্গিত ক'রে ইবনে কাসির ১৩নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: "বলা হয়, তারা ছিল মরিয়মের পুত্র ঈসার অনুসারী, কিন্তু আল্লাহ্ই তা ভাল জানেন। এটা সুস্পষ্ট যে তারা খ্রিষ্টান যুগেরও অনেক আগে বাস করত। তারা খ্রিষ্টান হলে ইহুদি র‍্যাবাইগণ কেন তাদের কাহিনীকে সংরক্ষণ করতে চাইবে? ইহুদিরা তো খ্রিষ্টানদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিল।" কাজেই আমরা মনে করতে পারি যে গুহার যুবকদের কাহিনীটি থেকে খ্রিষ্টান যোগসুত্র বাদ দেয়াটা অপরিহার্য, অর্থাৎ এর ইহুদি উৎস নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমরা যদি এই গল্পটি থেকে পরবর্তীকালে যা কিছু যোগ করা হয়েছে সেগুলিকে বাদ দেই এবং কেবলমাত্র এর মৌলিক অংশগুলি নিয়ে আলোচনা করি — যথা, পার্থিব জীবন থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন, নির্জন গুহায় যুগ যুগ ঘুমিয়ে থাকা, এবং অনির্ণীত সময় পার হবার পর অলৌকিক ভাবে জেগে উঠা — তাহলে দেখতে পাব এই আলেখ্যর সাথে সেই শতাব্দীগুলিতে ইহুদি ধর্মীয় ইতিহাসের একটা মিল রয়েছে। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল সংসার-বিরাগী Essene Brotherhood নামে এক সংগঠন, যা ঈসা (আ:)-এর আগে ও পরে বহু শতাব্দী ধরে সুপরিচিত ছিল, এবং ঈসা (আ:) নিজেও হয়ত এই সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তাদের কিছু অঙ্গ-সংগঠন মৃত সাগরের আশেপাশের এলাকাগুলিতে নির্জনবাস করত। সম্প্রতি মৃত সাগরের নিকটবর্তী কুমরান অঞ্চল থেকে যে সকল পাণ্ডুলিপি (Dead Sea Scrolls) পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে এদেরকে 'কুমরান সম্প্রদায়' নাম দেয়া হয়েছে। এসকল তত্ত্বের সমর্থনে আমি কুর'আনে ব্যবহৃত *আর-রাকিম* শব্দটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে অনুবাদ করেছি। ইবনে আব্বাস ও প্রথম যুগের অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে ভাষ্যকার তাবারী লিখেছেন যে, শব্দটি *মারকাম*-এর সমার্থক, অর্থাৎ যা কিছু লিখিত আকারে বিদ্যমান। এই ধারণার সাথে ইমাম রাযি আরও কিছু যোগ করে বলেন যে, সকল আরবী ভাষাবিদদের মতে আর-রাকিম এবং আল-কিতাব একই অর্থ বহন করে। এটা ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কুমরান সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে Essenes-দের মধ্যে সব চেয়ে বেশী নিষ্ঠাবান ছিল। তারা নিজেদেরকে জ্ঞান-চর্চা এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কপি করা ও সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত রাখত। তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনভাবে বাস করত। সততা ও পবিত্রতার জন্য তারা বহুল প্রশংসিত ছিল। সম্ভবত এসব কারণে সাধারণ ধার্মিকেরা তাদের মধ্যে অনেক অলৌকিক গুণ দেখতে শুরু করে, যার পরিণতিতে গুহার যুবকদের রূপক কাহিনী তাদের মানসে সহজেই স্থান পায়। এই যুবকেরা গুহায় 'ঘুমিয়েছিল', অর্থাৎ সমাজ থেকে অগণিত বৎসর বিচ্ছিন্ন ছিল, তারপর যখন তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটে গেল, তখন আবার 'জেগে' উঠল।

এই লোককাহিনীর উৎস ইহুদি হোক বা খ্রিষ্টান, কুর'আনে এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ্র ক্ষমতাকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যে, তিনি যেমন মৃত্যু (অথবা 'ঘুম') দিতে পারেন, তেমনি পুনরুত্থান (বা জাগরণ)-ও দিতে পারেন। আরও বুঝানো হয়েছে যে পবিত্র

জীবন পালন করলে মানুষ ঈমান রক্ষার খাতিরে মন্দ সংস্রব ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ হয়, যার ফলস্বরূপ মানুষের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক জাগরণ সম্ভব হয় যা সময় ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে যেতে পারে।

— মুহাম্মদ আসাদ: পবিত্র কুর'আনের অনুবাদ এবং ভাষ্য, পৃ ৪৩৭-৪৩৯

আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি যে, গুহার যুবকেরা যে খ্রিষ্টান ছিল, সে ব্যাপারে কুর'আনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইবনে কাসির, একমত নন। তিনি মনে করেন যে এই ঘটনা খ্রিষ্টান যুগের অনেক আগের। তারা যদি খ্রিষ্টান হতো তাহলে র‍্যাবাইগণ তাদের গল্প নিয়ে মাথা ঘামাতো কি জন্য? এবং এই যুক্তির সাথে আরও যোগ করা যায় যে, কাহিনীটি যদি খ্রিষ্টানভিত্তিক হয় তাহলে সেটা জানা না জানার উপর নবুয়তের সত্যতা নির্ভরশীল, এমন কথা ইহুদিরা চিন্তা করবে কেন? ইহুদিরা ঈসা (আ:)-কে মাসীহ, এমনকি নবী হিসেবেও মেনে নেয় নি। তারা তাঁকে ভণ্ড, মিথ্যাবাদি এবং (না'উযোবিল্লাহ) জারজ সন্তান মনে করত। অতএব এটা পরিষ্কার যে ঐ যুবকেরা বনী ইসরাঈলের অন্তর্গত ছিল।

ঐতিহাসিক ভাবে ইসরাঈলীরা বারে বারে আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও কুফরী করেছে। কুর'আনের বর্ণনায় তাদের পাপকে শির্‌ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যখন মূসা (আ:) আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন তারা তার অনুপস্থিতিতে একটা স্বর্ণের গো-বৎসের পুজা শুরু করে। সূরা কাহাফে আরেক যুগের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় আমাদের এই জনগণ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা শুরু করেছে, অর্থাৎ সেই সময় শির্‌কের ব্যাপক ছড়াছড়ি ছিল, এবং যারা শির্‌কের বিরুদ্ধে কথা বলত, তাদেরকে ভয় দেখান হতো এবং নিগ্রহ করা হতো। তাই দেখা যায় যে, গুহার যুবকেরা আত্মরক্ষার জন্য সাথে কুকুর রেখেছিল, এবং এই কুকুরটি তাদের গুহার প্রবেশপথে পা ছড়িয়ে দিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। আরও দেখা যায়, যাকে শহরে খাদ্য কিনতে পাঠানো হলো, তাকে বলা হলো: *সে যেন বিচক্ষণতার সাথে চলে এবং তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে জানতে না দেয়; নিঃসন্দেহে তারা যদি তোমাদের সম্বন্ধে জানতে পারে তবে তোমাদেরকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে (বা অপমান করবে, অভিশাপ দিবে, গালিগালাজ করবে), অথবা তাদের ধর্মে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফলকাম হবে না।*

এভাবে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আপোসহীন আনুগত্য প্রদর্শন ক'রে শির্‌কের বিরোধিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করল। তারা কোন ভয় ও অত্যাচারের পরোয়া করে নি। বরং অদম্য সাহসের সাথে ঈমানকে ধরে রেখেছে, এবং ধর্মবিমুখ সমাজকে চ্যালেঞ্জ করেছে: *আর আমরা তাদের হৃদয়ে শক্তি (এবং সাহস) বৃদ্ধি করেছিলাম যখন তারা উঠে দাঁড়ালো আর (একে অন্যকে ধর্মহীন সমাজের প্রতিবাদে) বলল: আমাদের প্রভু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, আমরা কখনই তাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে ডাকব না (অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা ছাড়া আর কোন ক্ষমতাকে মানতে রাজি না)। যদি করে বসি তা অতিশয় গর্হিত হবে (অর্থাৎ কুফরী হবে)। আমাদের এই স্বজাতিরা তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য উপাস্যদের গ্রহণ করেছে। এরা কেন তাদের উপাস্য সম্পর্কে কোন*

স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসে না? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বেশী অন্যায়কারী আর কে? (যখন সে অন্য কারো উপাসনা করার অধিকারের দাবী করে)।

সর্বশেষে, যখন অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল তারা তাদের জনগণকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো। তারা নিপীড়নের এলাকা থেকে আপেক্ষিক নিরাপদ স্থানে হিজরতের পথ বেছে নিলো। পালানোর পথে একটু আরাম করার জন্য তারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল: যখন তুমি মনে কর যে, শির্ককারীদের থেকে, এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছু পূজা করে সেসব থেকে পালানোর উপযুক্ত সময় এখনই, তখন ঐ গুহায় আশ্রয় নাও। অনুরূপ ভাবে ইব্রাহীম (আ:)-ও তার পরিবারকে নিয়ে ব্যাবিলন থেকে পালিয়েছিলেন, এবং আল্লাহ্ তাঁকে পবিত্রভূমি ফিলিস্তিনে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি, মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর অনুসারীরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাই বলা যায়, এই যুবকেরা উচ্চ মর্যাদার নবীদের মত তাদের বাড়ি, শহর, আরাম, ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে ঈমান রক্ষার্থে দূরবর্তী নিরাপদ স্থানে শরণার্থী হবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল।

রাসুলুল্লাহ (সা:) মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এমন সময় আসবে যখন তাদেরকে গুহায় পলায়নকারী যুবকদের অনুকরণ করতে হবে। হাদীসটি এই রকম:

আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত: নবী (সা:) বলেছেন: এমন একটা সময় সত্যই আসবে যখন একজন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে তার ছাগল (গৃহপালিত পশু), যা নিয়ে সে ঈমান রক্ষার্থে উপত্যকায় বা পাহাড়ে আশ্রয় খুঁজবে।

— সহীহ বুখারী

যেহেতু দাজ্জাল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সূরা কাহাফ পাঠ করতে হবে এবং যেহেতু দাজ্জালের সময়টা হবে শেষ যুগ অর্থাৎ কেয়ামতের যুগ, তাই এটা পরিষ্কার যে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই যুগে মানুষ স্রষ্টাবিমুখ ও পৌত্তলিক হয়ে যাবে। যারা ইসলামের প্রতি আস্থাশীল থাকবে, এবং ধর্মহীন পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, এই সূরাটি পরিষ্কারভাবে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, তারা ঐ তরুণদের মত ভয়, অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবে। এটাই হলো বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে যে চরম তীব্রতার সাথে যুদ্ধ চালানো হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।

গুহার ভেতরে প্রবেশ করার পর যুবকেরা অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করল। তারা বলল: *হে প্রভু! তুমি নিজ হতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর*। আল্লাহ্ তাদের এ ধরনের বিশ্বাসের নিদর্শন দেখে তাদের প্রতি দয়া পরবশ হলেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ এ ধরনের বিশ্বাস প্রদর্শনের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকেন। অতএব, তিনি তাদেরকে সহায়তা করলেন। সূরা কাহাফ এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তিনি আমাদের জন্যও তাই করবেন।

যুবকেরা ঈমান রক্ষা করতে গিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হলো, তার একমাত্র সমাধান ছিল ধর্মহীন সমাজ থেকে সরে যাওয়া। এ ব্যাপারে সূরা কাহাফে যে দিক-নির্দেশনা দেয়া রয়েছে তা সুস্পষ্ট: যদি আল্লাহ্ এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করাটা কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে মু'মিনের উচিত হবে ধর্মহীন জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, এবং হিজরত করা। আমরা জানি, ইতোমধ্যেই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, আর এটা দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকবে। রাসুলুল্লাহ (সা:) নিম্নোক্ত হাদীসে শেষ যুগের অত্যাচার সম্পর্কে বলেছেন:

"ইয়াহিয়া আমার নিকট বর্ণনা করেন মালিক থেকে, তিনি আবু জিনাদ থেকে, তিনি আল-আরাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা:) বলেছেন: কেয়ামত ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না একটি লোক আর একটি লোকের কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলবে: হায়! (কত ভাল হতো) এর জায়গায় যদি আমি হতাম।"

— মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক

সুমহান আল্লাহ্ যুবকদেরকে ঘুমের মধ্যে রেখে এবং তাদের কর্ণকুহরে বহির্বিশ্বের শব্দ প্রবেশকে বন্ধ রেখে তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন। তাই তারা সেখানে বছরের পর বছর ঘুমিয়েছিল। যখন তারা গুহায় ছিল, তখন আমরা তাদের কানের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছিলাম, এবং সেই অবস্থায় তারা অনেক বছর থাকল। (এভাবে তারা বর্হিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল)। যদি অন্যেরাও এমনি জায়গায় গিয়ে ধর্মহীন জগত থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে তারাও একই ধরনের ফল পেতে পারে।

প্রশ্ন করা যায়: আল্লাহ্ কিভাবে এত বছর ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের পুষ্টি যোগালেন? দ্বিতীয়ত, কিভাবে তিনি তাদের শরীরকে পচন থেকে রক্ষা করলেন? কারণ, আমরা জানি যে, একটা রোগী যখন দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থাকে তার শরীরে ঘা হয়ে যায়।

সূরা কাহাফে যে ভাবে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে একটা পরিষ্কার আভাস রয়েছে যে সৌর-শক্তি ব্যবহার করে এই যুবকদের শারীরিক নড়াচড়া ও পুষ্টি যোগানো হয়েছিল। যদি সৌর-শক্তি ব্যবহার করে দেহকে নাড়ানো যায়, তাহলে সেটা দিয়ে বৈদ্যুতিক পাখা, গাড়ি, এমনকি ফ্যাক্টরিও চালানো সম্ভব। এর মধ্যে ইশারা রয়েছে যে, আজকের কঠিন সময়ে, যখন দাজ্জাল তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, ঈমানদারগণ যেন সৌর-বিদ্যুত উৎপাদন করে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে সচেষ্ট হয়। যখন দাজ্জাল গোটা পৃথিবীকে পরিবহণ, খাদ্য উৎপাদন, শিল্প-কারখানা ও যাতায়াতের জন্য তেলের উপর নির্ভরশীল করে ফেলবে, তখন সে অবশ্যই তেলের দামকে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে দিবে।

আমাদের শত্রুরা তখন গোটা পৃথিবীর তেল সম্পদ সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিবে, এবং এরই ভিত্তিতে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে মানবজাতিকে ইসরাঈলের তথাকথিত মাসীহি শাসন মেনে নিতে বাধ্য করবে।

এই বই যখন ছাপাখানায় যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় মনে হচ্ছে ইসরাঈল একটা আণবিক যুদ্ধ বাধাতে চলেছে, যার মাধ্যমে সে ফোরাত নদীর দু'ধারের (অর্থাৎ ইরান, ইরাক, সাউদি আরব, কুয়েত এবং উপসাগরীয় দেশসমূহের) তেলের খনিগুলিকে দখল করতে চায়। রাসুলুল্লাহ (সা:) এই যুদ্ধগুলির (অর্থাৎ ইরাকের তেলখনি দখলের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের, এবং বাকি দেশগুলির তেলখনি দখলের জন্য ইসরাঈলি যুদ্ধের) ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। তিনি বলেছেন:

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন, "অচিরেই ফোরাত নদী স্বর্ণের গুপ্তধন (পাহাড়) প্রকাশ করে দিবে। ঐ সময় যারা থাকবে তারা যেন এ থেকে কিছুই না নেয়।" আল আ'রাজ আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল (সা:) একই কথা বলেছেন, তবে তিনি বলেছেন, "ইহা (ফোরাত) একটি স্বর্ণের পাহাড় বের করে দিবে।"

— সহীহ বুখারী

উবাই বিন কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন, ফোরাত নদী হতে একটি সোনার পর্বতের আবির্ভাব হবে; এই খবর ছড়িয়ে পড়লে সেখানে মানুষ জড় হবে। যারা ঐ সম্পদের মালিক হবে, তারা বলবে, আমরা যদি এদেরকে এখান থেকে নিতে দেই, তাহলে এরা সব নিয়ে যাবে। অতএব, তার দখল নিয়ে লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে প্রতি একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই নিহত হবে। আবু কামিলের বর্ণনায় রয়েছে: আমি এবং আবু কা'ব হাস্‌সানের ছাউনির তলায় একত্রে দাঁড়িয়েছিলাম।

— সহীহ মুসলিম

কুর'আনে ঘুমন্ত যুবকদের কাহিনীতে বলা হয়েছে গুহাটি এমনভাবে ছিল যে, সকালে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করলে যুবকেরা সেদিকে আকৃষ্ট হতো অর্থাৎ সূর্যের আলোর দিকে ঘুরে যেত। এই প্রক্রিয়াকে *phototropism* বলা হয়। আবার বিকালে সূর্যের আলো বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করত, এবং যুবকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় সেদিকে ঘুরে যেত। *আর সূর্য যখন উদিত হতো তখন তুমি দেখতে পেতে তারা গুহার ভেতরে ডান দিকে হেলে আছে, আর যখন অস্ত যেত তখন বাম পাশ দিয়ে (সূর্য) তাদেরকে অতিক্রম করছে, আর তারা গুহার ভেতরে এক বিস্তৃত জায়গায় পড়ে রয়েছে। আর তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল ঘুমন্ত; আর (তুমি তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে, কারণ) আমরা তাদের পাশ ফিরিয়ে দিতাম ডান দিকে ও বাঁ দিকে।* এভাবে প্রতিদিন ঘুমন্ত অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তনের কারণে তাদের শরীর শয্যাক্ষত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শরীরের প্রধান দেহযন্ত্রগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে নূন্যতম শক্তির প্রয়োজন, সেটা তারা সূর্যের আলো থেকে পেয়ে যেত। এই প্রক্রিয়াকে *photosynthesis* বলা হয়।

একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন যুবকেরা গুহায় কতদিন ঘুমিয়েছিল, অবশ্য কুর'আনে তিনশ (সৌর) বছরের কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাদের ঘুম থেকে জাগ্রত করলেন তখন তারা একে অপরকে কত লম্বা ঘুমিয়েছিল তা জিজ্ঞেস করতে শুরু করল।

দেখা গেল যে আসল (বা বাস্তব) সময় সম্পর্কে তাদের এক এক জনের এক এক ধারণা ছিল। কেউ বলল তারা একদিন অথবা তার কিছু অংশ ঘুমিয়েছিল। এটা তাদের কাছে *মনে হয়েছিল*। অন্যেরা (যারা জানতো যে, দেখে যা মনে হচ্ছে তা সত্যি নয়) বলল, আমরা কতদিন ঘুমিয়ে ছিলাম, তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। *আমরা তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করলাম দেখার জন্য যে কোন্ দলের অনুমান সঠিক ছিল।* সময়-সচেতনতার প্রশ্নে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল না, যা দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল। ঠিক তেমনি ফেৎনার যুগে সময়ের ব্যাপারে মানবজাতির মধ্যে দুই রকম অনুভূতি দেখা দিবে। এই যুগে মনে হবে সময় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত: "রাসূল (সা:) বলেছেন, শেষ ঘটিকা আসার আগে সময় সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। বছর মনে হবে মাসের মত, মাস মনে হবে সপ্তাহের মত, সপ্তাহ মনে হবে দিনের মত, দিন মনে হবে ঘন্টার মত, এবং ঘন্টা মনে হবে চুলা জ্বালাতে যে সময় লাগে তার মত।"

— জামে' তিরমিযী

এটা স্পষ্ট যে, দাজ্জালের কারসাজির কারণে মানুষ মনে করবে সময়ের গতি বেড়েই চলেছে। রাসূল (সা:) দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন, *সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন থাকবে; একদিন এক বছরের মত, একদিন এক মাসের মত, একদিন এক সপ্তাহের মত, এবং বাকি দিনগুলি তোমাদের দিনের মত*।

সূরা কাহাফ যে সকল ঈমানদারদেরকে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে রাখবে, তারা 'সময়', 'সময়ের পরিমাণ' এবং 'সময়ের গতি' সম্পর্কে সচেতন থাকবে, ঠিক যেমন গুহার যুবকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের ঘুম সাধারণ ঘুম ছিল না, অর্থাৎ তাদের ঘুমের পরিমাণ একদিন বা তার কিছু অংশ ছিল না।

এই বইয়ের পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমরা 'কুর'আন ও সময়' নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা ইসলামের বর্ণনা মতে সময়ের সাতটি জগতের কথা তুলে ধরেছি। এই জগতগুলি আমাদের সময়ের জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সূরা কাহাফে বর্ণিত যুবকেরা গুহার মধ্যে তিনশ বছর ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে, তারা কতটুকু সময় ঘুমিয়েছিল তার অনুমান করার চেষ্টা করল। কেউ বলল "একদিন বা তার কিছু অংশ"। এধরণের অনুমানের কারণ ছিল এতদিন কেটে যাওয়া সত্যেও তাদের মধ্যে বয়সের কোন ছাপ ছিল না। তাদের মাথার চুল, দাড়ি, নখ, চেহারার চামড়া ইত্যাদি সবই অপরিবর্তিত ছিল। তার মানে তারা পাশাপাশি ভাবে সময়ের দু'টি মাত্রা বা জগতে জীবিত ছিল। একটি ছিল প্রাণীজগতের সময়, যার মধ্যে তারা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে দিনে দুবার এপাশ ওপাশ করত। অপরটি ছিল অপ্রাণীজগতের সময়, যার মধ্যে তিনশত বছর থাকার পরও তাদের বয়স বাড়েনি।

অতএব এই কাহিনী আমাদেরকে সময়ের বিভিন্ন ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, যেগুলি এই পৃথিবীতেই পাশাপাশি ভাবে অবস্থান করছে। এই বিষয়টি বুঝতে পারার

মধ্যে নিহিত রয়েছে দাজ্জাল পৃথিবীতে যে সময়টুকু কাটাবে সে সম্পর্কে সেই হেঁয়ালিপূর্ণ হাদীসের ব্যাখ্যা। ঠিক এই কারণেই আমরা এই বইটি শুরু করেছি সময়ের উপর একটি অধ্যায় দিয়ে।

এই যুবকেরা নিশ্চয় খুবই ক্ষুধার্থ ছিল তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল একজন বাজারে গিয়ে কিছু খাবার কিনে আনুক। খাবার ক্রয় করার জন্য তাকে কিছু রৌপ্য মুদ্রা দেয়া হলো। তাকে সতর্ক করা হলো যেন সে পবিত্র (হালাল) খাবার কেনে: *সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম, এবং তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে (তোমাদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য)*।

দ্বিতীয়ত, তাকে সতর্ক করা হয়েছিল, সে যেন গুহার মধ্যে আর যারা আছে তাদের সম্পর্কে কারো নিকট কিছু প্রকাশ না করে, কারণ তাতে তাদের ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। *সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।*

যুবকটি যখন খাবার কেনার জন্য গুহা ছেড়ে শহরে গিয়েছিল তখন কি ঘটেছিল তা আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি। সেখানকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, মানুষের লেবাস ইত্যাদি, নিশ্চয় বদলে গিয়েছিল। এসব দেখে সে নিশ্চয় বিস্মিত, এমনকি ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কুর'আন অবশ্য এসব বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামায় না, তবে এটা পরিষ্কার করে দেয় যে, ইত্যবসরে যুবকদের পরিচিত জগতে আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তাদের সেই পৌত্তলিক সমাজ তখন আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসী সমাজে পরিণত হয়েছিল। এর প্রমাণ হলো যে তারা যুবকদের এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি *মসজিদ* তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একমাত্র ঈমানদারই এধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যে ধর্মহীন জগত ঈমানদার যুবকদের উপর অত্যাচার করত, তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক ঈমান-ভিত্তিক সম্প্রদায়। এই ঐশী বাণী মক্কার নির্যাতিত মুসলিমদের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করল। তারা নিশ্চয় এতে আশ্বস্ত হয়েছিল যে, মিথ্যার উপর সত্যের জয় হবেই।

তেমনি ভাবে এই ঘটনা আমাদেরও আশ্বস্ত করে যে, ইসলামের উপর বর্তমান যুগের আক্রমণ বেশী দিন চলতে পারে না। ইসলাম জয়ী হবেই। আর সূরা কাহাফের তেলাওত যেহেতু দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে রাখে, তাই বলা যায় যে বিশ্বাসীদেরকে আশান্বিত করার জন্যই এই সূরার মধ্যে আসহাবে কাহাফের কাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন সারা বিশ্ব একত্র হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে, এবং মুসলিমগণ এমন ভাবে অত্যাচারের শিকার হবে যে, তারা কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাববে, কত ভাল হতো যদি এই কবরে আমি থাকতাম, তখনও এই কাহিনী মুসলিমদেরকে আশ্বাস যোগাবে

যে, ইসলাম সকল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হবেই। অতএব মুসলিমদের উচিত কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস না হারানো, এবং হতাশাগ্রস্ত না হওয়া।

সেই যুবকেরা খাদ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিল, যার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফেৎনার যুগে আমাদের খাদ্যও এত বেশী রাসায়নিক ভাবে পরিবর্তিত (genetically modified) ও ভেজালমিশ্রিত হবে যে ঐ সকল খাদ্য সেই কাজে আসবে না যা আল্লাহ্ তার মধ্যে নিহিত রেখেছিলেন। যেমন দুধ এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্য রোগ প্রতিরোধ করে। কিন্তু যখন বেশী দুধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গরুকে হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয় তখন তার দুধ দূষনীয় হয়ে যায়। এই দুধ শরীরের জন্য উপকারী হতে পারে না, বরং তার দ্বারা মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে ঈসা (আ:) বনী ইসরাঈলদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার সাথে সূরা কাহাফের কাহিনীর মিল পাওয়া যায়:

"ইয়াহিয়া আমাকে মালিকের বরাত দিয়ে বলেছেন: তিনি শুনেছেন যে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ:) বলতেন: হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের অবশ্যি বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত, আর মাটির সবুজ উৎপাদন আর যবের রুটি খাওয়া উচিত। গমের রুটি সম্পর্কে সচেতন হও; তোমরা এটার প্রতি খুব একটা কৃতজ্ঞ হবে না।"

— মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক

সব শেষে, খাবার কেনার জন্য যুবকেরা যে মুদ্রা ব্যবহার করতে যাচ্ছিল সেদিকেও কুর'আনে সূক্ষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এটা ছিল *ওয়ারিক*, অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রা। *তোমাদের একজন এই রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে শহরে যাও*। সূরা কাহাফের সতর্কবাণী অত্যন্ত পরিষ্কার। শেষ যামানায় ঈমানদারদেরকে অবশ্যই টাকার প্রতি সচেতন হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই আসল টাকা এবং ভূয়া টাকার মধ্যে পার্থক্যটা কী তা জানতে হবে। আসল টাকা হিসেবে সকল যুগে আল্লাহ্র নবীগণ সোনা ও রূপা এবং কিছু পণ্য দ্রব্য যেমন গম, যব, খেজুর ও লবণ ইত্যাদিকে ব্যবহার করেছেন। আসল টাকার একটি অন্তর্নিহিত মূল্য আছে (অর্থাৎ টাকার মূল্য টাকার মধ্যেই থাকার কথা)। অন্যদিকে, ভূয়া টাকা যে ছাপায়, সে-ই তার মূল্য নির্ধারণ করে। এটার বদলে আসল টাকা চাইলেও পাওয়া যাবে না। যখন টাকার দাম পড়ে যায়, তখন আসলে আইনগত চুরির মাধ্যমে এক বিশাল সম্পদ সাধারণ মানুষের হাত থেকে দেশী-বিদেশী শোষক সমাজের হাতে চলে যায়। এটাকেই *রিবা* বলা হয়। (এ বিষয়ে দেখুন আমার বই দু'টি: *The Importance of the Prohibition of Riba in Islam* এবং *The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah*)।

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন মানবজাতি ভূয়া টাকার জালে আটকে পড়েছে, এবং তাদের সম্পদ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে। বহু মানুষ শ্রম-দাসে পরিণত হয়ে গেছে।

আধুনিক বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এই কাহিনীর তাৎপর্য

এ পর্যন্ত আমরা কাহিনীটির সাধারণ তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার দেখতে হয় ঐ যুবকদের সাথে সেই সমাজের সংঘাতের মৌলিক কারণ কি ছিল। সোজা কথায়, এর কারণ ছিল এই যে তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করত। *আমাদের এই স্বজাতিগণ, তাঁর পরিবর্তে অনেক মা'বূদ গ্রহণ করেছে। তারা এসব মা'বূদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে?* সেই অপরাধটি ছিল শির্‌কের অপরাধ, যা আল্লাহ্ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

إِنَّ اللَّـــهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّـــهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরিক করলে তাকে ক্ষমা করবেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন; এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত শরিক করে সে মহা পাপ করে। (*শির্‌ক হলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা অথবা অন্য কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নেয়া বা উপাসন করা*)।"

— সূরা নিসা, ৪:৪৮

আজ আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করি যেখানে শির্‌ক্‌কে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ শির্‌ক সারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অনেক ইসলামি পন্ডিত অথবা চিন্তাবিদগণ এবং ইসলামি সংগঠনগুলি হয় এটা বুঝতে পারেন না অথবা তারা, গুহার যুবকদের মত, প্রকাশ্যে শির্‌কের নিন্দা জ্ঞাপন করতে অনিচ্ছুক।

আধুনিক বিশ্বের কতিপয় কার্যক্রমকে সহজেই শির্‌ক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আল্লাহ্ রিবা (অর্থাৎ সুদে টাকা লেনদেন), মদ, জুয়াখেলা, পুরুষ সমকামিতা এবং নারী সমকামিতা, গর্ভপাত, ইত্যাদিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্রগুলিসহ সারা বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রগুলি এইসব নিষিদ্ধ কার্যক্রমের অনুমতি দিয়েছে, অথবা অনুমতি দিতে চলেছে। আল্লাহ্ যেসব কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলিকে আইন করে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে।

আল্লাহ্-তা'আলা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। (সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে)। তবে শর্ত হলো স্বামীকে সকল স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ এবং সকলের মাঝে সমতা রক্ষা করার সামর্থ থাকতে হবে। আল্লাহ্ আরো ঘোষণা করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবনই মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে অনুকরণীয়। মহানবী (সা:)-এর অনেক স্ত্রী ছিলেন।

আধুনিক বিশ্বের শির্কী কার্যক্রমকে পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়। আজ সারা বিশ্বের সরকারগুলি আল্লাহ্‌র অনুমোদনকৃত কাজগুলিকে নিষিদ্ধ করছে। একাধিক বিবাহকে, এবং ১৬ বছরের কম (কখনো ১৮ বছরের কম) বয়সের মেয়েদের বিবাহকে নিষিদ্ধ করছে।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন সেটাকে তারা নিষিদ্ধ করে এবং আল্লাহ্ যে কাজ নিষিদ্ধ করেছেন সেটার তারা অনুমতি দেয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তার অনুমতি দেয় এবং আল্লাহ্ যার অনুমতি দিয়েছেন তা নিষিদ্ধ করে, তার সম্পর্কে কুর'আনে কি বলা আছে তা দেখা যাক। এবং এর ব্যাখ্যায় রাসূল (সা:) যা বলেছেন তাও আমরা আলোচনা করব।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّـهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

"তাদের কি এমন কতগুলো শরিকও আছে যারা তাদের জন্য এমন দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই? ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।"

— সূরা শূরা, ৪২:২১

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَـٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়ম তনয় মাসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা'বূদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তারা তাঁর সাথে যেসকল অংশী স্থির করে তিনি সেসব হতে পবিত্র।"

— সূরা তওবা, ৯:৩১

"আদি বিন হাতিম নামক একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পুর্বে রাসূল (সা:)-এর কাছে এলেন। যখন তিনি রাসূল (সা:)-কে কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওত করতে শুনলেন তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিন্তু তারা (ইহুদিরা) তো তাদের (র‍্যাবাইদের) ইবাদত করে না। রাসূল (সা:) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তারা আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, মানুষকে তার অনুমতি দেয় না, এবং আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন সেটার অনুমতি দেয়, এবং লোকেরা তাদেরকে মেনে নেয়। এটাই হলো তাদেরকে ইবাদত করা।"

— সুনান তিরমিযী

অনুরূপ ভাবে খ্রিষ্টানরা দাবী করে যে, ঈসা (আ:) স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে তাঁর শিষ্যদেরকে কোন্ কাজ করা যাবে, কোন্ কাজ নিষিদ্ধ হবে, সেটা বিবেচনা করার অধিকার দিয়ে গেছেন। তিনি নাকি বলেছেন:

"আমি তোমাদের বলছি, তোমরা পৃথিবীতে যা অবৈধ মনে করবে, তা স্বর্গেও অবৈধ হবে, আর যার অনুমোদন দিবে, তা স্বর্গেও অনুমোদিত হবে।"

— বাইবেল, নতুন নিয়ম, মথি, ১৮:১৮

এটা স্পষ্ট যে, মথির এই উক্তি আসলে ছিল, যাকে স্বর্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা পৃথিবীতেও নিষিদ্ধ হবে, আর যাকে স্বর্গে বৈধ করা হয়েছে তা পৃথিবীতেও বৈধতা লাভ করবে।

পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমগণ আজ সেই সকল সরকারের কর্তৃত্বে আনুগত্য পোষণ করে যারা শির্‌কে লিপ্ত রয়েছে। তারা নির্বাচনে তাদেরকে ভোট দেয়। তারা সেই সংবিধান অনুসারে শপথ নেয় যা সরকারকে শির্‌ক করার অধিকার দেয়। তারা সেই সরকারের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থেকে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে। এতে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই যে, আমাদের প্রায় সকলেই (কিছু লোক ব্যতীত) শির্‌কের সাথে জড়িত রয়েছেন। তা সত্যেও বহু ইসলামি পন্ডিত এই সকল দেশগুলির প্রতি নিরপেক্ষ ভাব পোষণ করেন, তাদের শির্‌ককে দেখেও দেখেন না, এমনকি তাদের সরকারের সক্রিয় সমর্থক হিসেবে কাজও করেন।

প্রিয় নবী (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, দাজ্জালের সময় মানবজাতি বহু শির্‌কের সম্মুখীন হবে। তিনি আরো সতর্ক করেছেন যে, শির্‌কের আক্রমণকে চেনা এমনই কঠিন হবে যেমন *অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিপড়াকে চিনতে পারা*। রাসূল (সা:)-এর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যে কিভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে তার একটা নিদর্শন হলো সপ্তাহের দিনগুলির নাম এবং বছরের মাসগুলির নাম, যা এখন পৃথিবীর সব দেশেই (*ইল্লা মাশা'আল্লাহ্*) ব্যবহার করা হচ্ছে।

"রবিবার" থেকে "শনিবার" পর্যন্ত সপ্তাহের সকল দিনগুলি, এবং "জানুয়ারি" থেকে "ডিসেম্বর" পর্যন্ত বছরের সকল মাসগুলি পৌত্তলিক দেবতাদের নামে রাখা হয়েছে। যখন আমরা সপ্তাহের ক্ষেত্রে দিনের নাম এবং বছরের ক্ষেত্রে মাসের নামগুলি রাখতে গিয়ে সুন্নাহকে পরিত্যাগ করি, তখন আমরা শির্‌কে প্রবেশ করি। বস্তুতঃ পবিত্র কুর'আনে বেশ কতকগুলি দিন এবং মাসের নাম দেয়া আছে। এই নামগুলির ক্ষেত্রে সুন্নাহ হচ্ছে:

ইয়াওমুল আহাদ (সপ্তাহের প্রথম দিন); ইয়াওমুল ইসনাইন (সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন); ইয়াওমুস সালাসা (সপ্তাহের তৃতীয় দিন); ইয়াওমুল আরবা'আ (সপ্তাহের চতুর্থ দিন); ইয়াওমুল খামিস (সপ্তাহের পঞ্চম দিন); ইয়াওমুল জুমু'আ (জুম্মার দিন); এবং ইয়াওমুস সাব্‌ত (সপ্তাহের সপ্তম দিন)।

কমপক্ষে সপ্তাহের দু'টি দিনের নাম কুর'আনে পাওয়া যায়। নাম দু'টি হলো ইয়াওমুল জুমু'আ এবং ইয়াওমুস সাব্‌ত।

একইভাবে বছরের মধ্যে মাসের নামগুলি সুন্নাহ অনুসারে হচ্ছে:

মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী, জামাদিউল আউয়াল, জামাদিউস সানী, রজব, শা'বান, রমযান, শাউওয়াল, যিলক্বদ, যিলহজ্জ।

এই নামগুলোর মধ্যে একটি নাম কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হলো রমযান মাস।

সূরা কাহাফে বর্ণিত যুবকদের কাহিনীতে শির্‌কের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী থাকার কারণে কাহিনীটি ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ্-তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার কথা উচ্চারণ করে শেষ করা হয়েছে:

. . . وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

" . . . তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:২৬

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্‌র নিকট মূসা (আ:)-এর সেই দু'আ করার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যখন মূসা (আ:) নিজেকে এমন এক জায়গায় পেলেন যেখানকার লোকেরা শির্‌ক্‌কে সাদরে গ্রহণ করেছিল, এবং শির্‌কি কার্যক্রম ছাড়ছিল না। দোয়াটি এই:

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

"তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমি শুধু নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের ও এই সত্যত্যাগীদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।"

— সূরা মায়েদা, ৫:২৫

আধুনিক যুগে বিশ্বের সর্বত্র শির্‌ক যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, উপরে সে সম্পর্কে আমরা ব্যাখ্যা করেছি, এবং সারা বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে চলেছে, সেটার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। পবিত্র কুর'আনে সূরা কাহাফে বর্ণিত যুবকদের ঘটনা আমাদেরকে যে শিক্ষা দেয়, তা কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, এবার সেই আলোচনা করা যাক। যখন জরুরী হয়ে পড়বে, আমরাও ঈমান রক্ষা করার জন্য সেই যুবকদের মত ধর্মহীন পৃথিবী থেকে সরে দাঁড়াব।

প্রখ্যাত তুর্কি পন্ডিত ও চিন্তাবিদ, বদিউজ্জামান সাঈদ নুর্সী, খিলাফত বিলুপ্ত হবার পর তার দেশবাসীকে শহর ত্যাগ করে দশ হাজার গ্রামে গিয়ে তাদের ঈমান রক্ষা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

আমাদের অভিমতও তাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইয়াজুজ-মাজুজের আধুনিক যুগে মুসলমানদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ছোট ছোট ইসলামি সমাজ গড়ে তোলা, যার nucleus বা মূলাধারে থাকবে সব চেয়ে সৎ ঈমানদারগণ। তারাই আচার-ব্যবহার, এবং বিশেষ করে এবাদতের, মান নির্ণয় করবে, যা সেই গ্রামের বাকি সকলে পালন করবে।

সূরা কাহাফে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের যুগে মুসলমানদেরকে সেই সকল লোকের সংসর্গে থাকতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ একদিকে এদেরকে বাদ দেয়া, আর অপর দিকে আধুনিক দুনিয়ার জাঁকজমকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, এই দু'টা থেকে খুব সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত অনন্যসুন্দর আয়াতে একথাই বলা হয়েছে, যার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হলো:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

সরল অনুবাদ

"তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে, তাদের সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে, এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে, এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:২৮

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

"এবং তুমি নিজেকে ধৈর্য্য সহকারে রাখবে (*অর্থাৎ বিচার দিবস আসার পূর্ব পর্যন্ত ঐ সকল আন্তরিক ঈমানদারদের খোঁজে থাকবে*) যারা সকাল-বিকাল (*তাদের মন ও মানস উজাড় করে*) তাদের প্রভুকে ডাকে, এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে (*অর্থাৎ, আবেগের সাথে, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়*), এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না (*অর্থাৎ ধর্মহীন পৃথিবীর ফাঁদে পা দিয়ো না, তাদের দেয়া পারিতোষিক নিয়ে ন্যায়বানদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ো না*), এবং তুমি তাদের আনুগত্য করো না (*অর্থাৎ মান্য করো না, নেতৃত্ব অনুসরণ করো না*) যাদের অন্তরকে আমি আমার স্মরণে (*অর্থাৎ সর্বক্ষণ বিশ্বপ্রভুর স্মরণ থেকে*) অমনোযোগী করে দিয়েছি, কারণ তারা (*একমাত্র*) তাদের নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে (*অর্থাৎ ক্ষমতা, খ্যাতি, ও সম্পদের লিপ্সা*

চরিতার্থ করে), এবং সকল ভাল এবং সত্য কাজ পরিত্যাগ করে (*আর আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়*)।"

বিশদ ব্যাখ্যা

সূরা কাহাফের এই আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে আরও অধিক সদোপদেশ দেয়া হয়েছে, যে কিভাবে তারা দাজ্জালের যুগে ধর্মহীন পৃথিবীর মোকাবিলা করবে, আর কিভাবে তারা ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্ব-ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরোধিতা করবে।

এই উপদেশের মূল কথা হলো বিশ্বাসীরা যেন সংসর্গ বেছে নেবার সময় খুবই সতর্ক থাকে। এবং সমমনা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের সাথে বিশেষ এলাকায় বাস করে। তারা যেন সেই সকল ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্টতা বাড়ায় যাদের ধার্মিকতা, বিনয়, আল্লাহ্-ভক্তি, এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতার আলো সর্বক্ষণ বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

সারা বিশ্বে যখন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে, তখন যেন সেই মু'মিন ব্যক্তিরা আল্লাহ্ এবং তার প্রিয় রাসূল (সা:)-এর প্রতি অনুগত থাকার দৃঢ় সংকল্পকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

অপর দিকে তাদের উচিত হবে সেই সকল লোকদের সংসর্গ ত্যাগ করা, যাদের কার্যকলাপে ধর্মহীনতা, পাপ, লালসা, গর্ব, দম্ভ, হঠকারিতা, প্রতিহিংসা এবং বিদ্বেষের ছাপ দেখা যায়, এবং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করে। এ সমস্ত অসদ্‌গুণের অধিকারী লোকেরা নিজ খেয়ালখুশী নিয়ে ব্যস্ত থাকে, এবং তাদের সকল কাজ একদিন মূল্যহীন হয়ে যাবে।

৬ § এক ধনী ও এক গরীবের রূপক-কাহিনী

পবিত্র কুর'আনের সূরা কাহাফে বর্ণিত যেসকল যুবকেরা পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাদের কাহিনীর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূলতঃ তারা যে শির্ক থেকে বাঁচার জন্য পালিয়েছিল সেকথাই সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। এটাই সব চেয়ে বড় ও ভয়াবহ পাপ যা আল্লাহ্-তা'আলা কখনই ক্ষমা করবেন না বলে জানিয়েছেন। (অর্থাৎ, যদি কেউ এই পাপের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা না চেয়ে মারা যায়, তাহলে)।

গুহায় আশ্রয় নেয়া যুবকদের কাহিনী শেষ করার পরই সূরা কাহাফ এই একই বিষয়ে ফিরে যায়, শির্কের আরেক চেহারা তুলে ধরার জন্য, যার ছড়াছড়ি হবে দাজ্জালের যুগে। কাহিনীটি দুই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, যাদের একজনকে আল্লাহ্ দু'টি উর্বর বাগান দিয়ে সম্পদশালী করেছিলেন; আর অপরজন ছিল গরিব, তাকে সম্পদ দেয়া হয়নি। ধনী লোকটি সম্পদের মোহে প্রতারিত হয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। বাহ্যিক ভাবে সে আল্লাহ্র উপাসনা করলেও প্রকৃতপক্ষে সে তার সম্পদের (অর্থাৎ দুনিয়ার) পূজা করত। এটাই ছিল তার শির্ক। পরিশেষে, আল্লাহ্র শাস্তি তাকে পাকড়াও করল এবং তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।

অন্যদিকে গরিব লোকটি বুঝতে পেরেছিল যে, ধনী লোকটির অন্তরে শির্ক স্থান করে নিয়েছে। তাই সে ধনী লোকটিকে আল্লাহ্র শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলল, সুমহান আল্লাহ্ তোমার বাগান ধ্বংস করে তোমার সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন।

দরিদ্র লোকটি ধনী লোকটির সম্পদের প্রতি কোন ঈর্ষা পোষণ করত না। বরং যে মহান আল্লাহ্ তাকে এত সম্পদ দিলেন সেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য পোষণ করার জন্য এবং কৃতজ্ঞ হবার জন্য সে তাকে পরামর্শ দিল। দরিদ্র লোকটি এই আশাও ব্যক্ত করল যে, আল্লাহ্ তাকে পরজগতে ধনী লোকটির বাগানের চেয়েও উত্তম বাগান দান করতে পারেন, যা দুনিয়ায় তার দারিদ্র্য অবস্থার তুলনায় অনেক উত্তম হবে।

সূরা কাহাফের এই বর্ণনায় বর্তমান বিশ্বের অবস্থাটাই পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদ আধুনিক জীবনের প্রধান উপকরণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। লোভ, সম্পদের লিপ্সা, বিত্তসমাগম, যৌনতা, ইত্যাদিতে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ জড়িয়ে পড়েছে। অনেক মুসলিমও এসব কাজে লিপ্ত রয়েছে।

যারা কেবল দুনিয়া পাওয়ার আকাঙ্খা লালন করে তাদেরকে এই সূরা সতর্ক করে দেয় যে, দুনিয়া এমন কিছু দিতে পারে না যা চিরস্থায়ী। সবকিছুই ধ্বংস হবে এবং অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। সেজন্য দুনিয়া পাওয়ার আশায় এই পৃথিবীতে থাকার পরিবর্তে

মু'মিনের উচিত পরকাল পাবার আশায় এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় জীবন-যাপন করা। যদি সে গরীব হয় তাহলেও তার উচিত হবে এসব দুঃখকষ্টে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ধৈর্য্য ধারণ করা, এবং এই বিশ্বাসে অটুট থাকা যে, আল্লাহ্ তার ইবাদত, আনুগত্য ও ধৈর্যের পরিবর্তে পরকালে অনেক উত্তম প্রতিদান দিবেন।

এই বাণীর সংক্ষিপ্তসার সূরা কাহাফের এক অবিস্মরণীয় আয়াতে এভাবে রয়েছে:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, তবে তোমার প্রতিপালকের নিকট সৎকর্মের ফল হবে স্থায়ী, এবং এই আশ্বাসের মধ্যেই রয়েছে প্রতিদানের সকল আশা।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৪৬

এখানে এই রূপক-কাহিনীর বর্ণনা তুলে ধরা হলো, যা বত্রিশ নং আয়াতে শুরু হয়ে ছেচল্লিশ নং আয়াতে শেষ হয়েছে:

আয়াত-৩২

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

"তুমি তাদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা পেশ কর। আমি তাদের একজনকে দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং এদু'টিকে খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম, এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।"

আয়াত-৩৩

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

"উভয় বাগানই ফল দান করতে কোন ত্রুটি করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।"

আয়াত-৩৪

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

"অতএব এই ব্যক্তি প্রচুর ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার সঙ্গীকে বলল: আমার ধনসম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমার রয়েছে প্রচুর সম্মান ও ক্ষমতা।"

আয়াত-৩৫

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

"এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল: আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আয়াত ৩৬

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾

"আমি এও মনে করি না যে (*হিসাবের*) সেই ক্ষণ (*কখনো*) আসবে। (*এটার সম্ভাবনা এত কম যে, আসলে, এটা ঘটবেই না*)। (*বস্তুত*), আমাকে যদি আমার প্রভুর সামনে উপস্থিত করাই হয়, তাহলে নিশ্চয় (*সেখানে*) আমি এর পরিবর্তে আরও উত্তম (*পুরস্কার*) পাব।"

আয়াত-৩৭

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

"তার সঙ্গী তদুত্তরে বলল: তুমি কি তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষের আকৃতিতে?"

আয়াত-৩৮

لَّـٰكِنَّا هُوَ اللَّـهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

"কিন্তু আমি বলি, আল্লাহ্ই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরিক মনে করি না।"

আয়াত-৩৯

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّـهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّـهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

"(*অতঃপর সে ধনী লোককে জিজ্ঞেস করল*) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম মনে কর, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন একথা বললে না 'মাশা'আল্লাহ্', আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।"

আয়াত-৪০

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

"কিন্তু (*স্মরণ রাখ*) আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানের উপর আসমান থেকে অগ্নি বর্ষণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।"

আয়াত-৪১

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾

"অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

আয়াত-৪২

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾

"(*ঠিক তাই হলো*) তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্যে হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল। যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল সে বলতে লাগল: হায়, আমি যদি কাউকেও আমার পালনকর্তার শরিক না করতাম!"

আয়াত-৪৩

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّـهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾

"এবং সে আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কাউকে পেল না এবং (*তার এই দুরবস্থা থেকে*) সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।"

আয়াত-৪৪

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّـهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

"এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহ্‌রই, যিনি সত্য। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রতিদান শ্রেষ্ঠ।"

আয়াত-৪৫

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

"তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। এটা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর এর সংমিশ্রনে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতাপাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা শুকিয়ে এমন ভাবে গুঁড়া হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ এসবকিছুর উপর শক্তিমান।"

আয়াত-৪৬

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, তবে তোমার প্রতিপালকের নিকট সৎকর্মের ফল হবে স্থায়ী, এবং এই আশ্বাসের মধ্যেই রয়েছে প্রতিদানের সকল আশা।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৩২-৪৬

ধনী ও গরীবের এই রূপক-কাহিনী বর্ণনার ভেতর দিয়ে সূরা কাহাফ সতর্ক করে দিচ্ছে যে, সম্পদ মানুষকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যায় এবং ঈমানকে নষ্ট করে। কাহিনীর শেষে বিচার দিবসকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং যাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে তাদের পরিণতি কি হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

কাহিনীটির গুরুত্ব

এই রূপক কাহিনীটি দুইজন লোক এবং তাদের বিপরীত-ধর্মী জীবন ধারাকে তুলে ধরে, যা দাজ্জালের যুগে ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত হবে।

আল্লাহ্ মানুষকে সম্পদ দান করেন আমানত হিসেবে, এবং এ জীবনে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। যে সম্পদ ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, সেটা দিয়েই তিনি শাস্তি দান করেন। যদি সম্পদ অবৈধভাবে অর্জিত হয়, যেমন আধুনিক সুদযুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা অথবা বীমার মাধ্যমে, তাহলে সেটা হারাম বলে বিবেচিত হবে, এবং তার মালিক জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

ইহবাদ এবং তার ফলস্বরূপ বাস্তবাদের দর্শন, আল্লাহ্ এবং ধর্মকে পরিহার করে, এবং সেটা আত্মাকে নানা ভাবে ব্যাধিগ্রস্ত করে। শেষ যুগের প্রধান ব্যাধি হবে সম্পদের লালসা, যা মানুষকে আধ্যাত্মিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে অন্ধ করে দিবে। তারা মগজ ধোলাইয়ের ফলে এক কাল্পনিক জগতে (অর্থাৎ বোকার স্বর্গে) বাস করতে থাকবে, এবং মহা আনন্দে জাহান্নামের আগুনের দিকে এগিয়ে যাবে। এই ব্যাধিকে চিহ্নিত করার ভেতরেই রয়েছে সূরা কাহাফের এই গল্পটির গুরুত্ব।

আধুনিক বিশ্ব, সম্পদ এবং সম্পদশালীদের জীবনযাপনকে মোহনীয় করে তুলেছে। পরিণামে গরিব তার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে, এবং বৈধ অবৈধ যে কোন উপায়ে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। এর ফলশ্রুতিই হয় রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, অপহরণের মত সকল সহিংস অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে পুরো সমাজই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কারণ ধনীরাও তাদের সম্পদ উত্তরাত্তর বৃদ্ধিকল্পে অবৈধপন্থা অবলম্বন করে।

এই সূরায় বর্ণিত দরিদ্র ব্যক্তিটি কোন কিছু নিয়েই গর্ব করেনি। সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাশীল ছিল। পরিণামে আল্লাহ্ ধনী ব্যক্তিটির সম্পদ ধ্বংস করে দেন এবং

সব শেষে দরিদ্র ব্যক্তিই সুখী হয়। যে জগতে ধনীদেরকে 'বিশেষ ব্যক্তি' মনে করা হয়, এবং দারিদ্র্যকে অশুভ মনে করে সেটার বিমোচনের উদ্যোগ নেয়া হয়, সেখানে অভাজনদের জন্য এই সূরা সান্তনা, আশা ও আল্লাহ্‌র সাহায্যের এক জোরালো বার্তা নিয়ে এসেছে।

কুর'আনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী রূপকটির সারকথাকে যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা এখানে সংশোধিত আকারে দেয়া হলো:

"সেই উদ্ধত ব্যক্তি যে তার সম্পত্তি, তার উপার্জন, তার বৃহৎ পরিবার, এবং তার অনুসারীদের সংখ্যা নিয়ে ফুলে উঠেছিল, এবং তার আত্মতুষ্টির কারণে মনে করত এগুলি চিরদিন টিকে থাকবে। সে অন্যায় ভাবে তার সহচরকে ছোট মনে করত যে ততটা সম্পদের মালিক ছিল না, কিন্তু মানুষ হিসাবে তার চাইতে ভাল ছিল। ধনী ব্যক্তিকে তার সম্পদ নয় বরং তার মনোবৃত্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল। সে তার প্রতিবেশীর উপর ততটা অন্যায় করেনি যতটা তার নিজের আত্মার উপর করেছিল। বস্তুর ভালবাসার কারণে সে আধ্যাত্মিক দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিল, এমনকি সেই দায়িত্বের বিরোধিতাও করেছিল। আয়াত নং ৩৭-এ বলা আছে, সে তার সঙ্গীকে চমক দেখাবার জন্য সাথে নিয়ে গেল, কিন্তু তার সঙ্গী মোটেও প্রভাবিত হলো না। এখানেই রয়েছে বস্তুবাদীর সীমিত বুদ্ধির পরিচয়। 'উত্তম' বলতে সে বেশী সম্পদ, বেশী ক্ষমতাকে মনে করত, যা সে এই জীবনে ভোগ করছিল, যদিও বাস্তবে এসবই ছিল এক ফাঁপা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ধ্বংস হয়ে গেল এবং সেই সাথে তাকেও নিঃশেষ করে দিল।

"তার সহচরের যুক্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ দাম্ভিক ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করায় সে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। ২ তারপর তার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে ঘোষণা করল যে আল্লাহ্ এক এবং তিনিই উত্তম। ৩ আল্লাহ্‌র নিয়ামত কিভাবে কৃতজ্ঞতার সাথে উপভোগ করতে হয়, সে সেটাও বুঝিয়ে দিল। ৪ তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে সে আল্লাহ্‌র উপর কত সন্তুষ্ট ও তৃপ্তি অনুভব করে, তাও বুঝিয়ে দিল। সবশেষে, ৫ সে সতর্ক করে দিল যে, পৃথিবীর সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, এবং অসংযত দম্ভের জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি সুনিশ্চিত।"

— আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, কুর'আনের অনুবাদ ও ভাষ্য
সূরা কাহাফ, টীকা নং ২৩৭৬-২৩৮০

বর্তমান পৃথিবীতে গোটা মানবজাতির উপর যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বস্তুবাদের আধিপত্য চলছে, বিশ্বাসীরা কিভাবে তার মোকাবেলা করবে? এই প্রশ্নের উত্তরের চাবিকাঠি রয়েছে সূরা কাহাফের মধ্যে। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর ভাষ্য এইরূপ:

"যে বজ্রপাত দিয়ে ধনী উদ্ধত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাকে *হুসবানান* বলা হয়েছে। তবে এই শব্দের উৎস হলো *হিসাব*, যা যে কোন শাস্তিকে ব্যক্ত করে। হয়ত এখানে ভূমিকম্পকেও বুঝানো হয়েছে, যা মাটির উপরে বা নীচের জলপ্রবাহকে বদলে দিতে পারে, মাটির ভেতর থেকে পলি ও বালি উপরে নিক্ষেপ করতে পারে এবং বিশাল এলাকাকে ধ্বংস

করতে পারে। 'ফলাফল', 'ব্যয়', 'হাতে হাত রেখে আক্ষেপ' ইত্যাদি কথাগুলির আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি রূপক অর্থও বুঝতে হবে। তার যে বিশাল উপার্জন এবং সন্তুষ্টি ছিল তা সবই চলে গেল। সে তার সম্পত্তির উপর প্রচুর খরচ করেছিল। সে এটার চিন্তাতেই বিভোর থাকত। তার আশা আকাঙ্খা এর উপরই নির্মিত ছিল; এটাই ছিল তার জীবনের প্রধান অনুরাগ। কত ভাল হতো যদি সে এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদের পরিবর্তে একটু আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরাত!

"এক্ষেত্রে তার মনে তার নিজের সত্তা এবং তার ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। সে জনসংযোগের জাল বিস্তার করেছিল, তার উপর নির্ভরশীল মানুষজন তার বাধ্য ছিল, এবং তার 'তীরভর্তি তূণের' গর্ব ছিল। কিন্তু সে নিজেকেই সাহায্য করতে পারে নি, অন্যেরা তার কি সাহায্য করতো? সবই তো লোক-দেখানো, অনিশ্চিত আর সময়ের খেলা। বাস্তব সত্য এবং প্রকৃত আশা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই হাতে রয়েছে। অন্য সকল পুরস্কার ও সাফল্য কেবলমাত্র ভ্রম। উত্তম পুরস্কার এবং উত্তম সফলতা আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই আসে।"

— আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, কুর'আনের অনুবাদ ও ভাষ্য
সূরা কাহাফ, টীকা নং ২৩৮০-২৩৮৫

আধুনিক স্রষ্টাবিমুখ বিশ্ব আল্লাহ্‌র দিক থেকে চোরাগোপ্তা ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের ভান করে, কিন্তু আসলে তা এক প্রতারণা।

এই দুই ব্যক্তির গল্পটির মধ্যে মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যাকে দাজ্জালের যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে সেই ধনী ব্যক্তির বাগান যে ভাবে ধ্বংস হয়েছিল, তেমনই কুফ্‌র ও শির্‌কের জগতও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং বিশুদ্ধ পানির সংকটে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে:

. . . وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾
أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾

" . . . (তোমার) বাগানের উপর আসমান থেকে আগুন বর্ষণ করবেন (*শাস্তি হিসেবে*)। যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে, অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে, এবং তুমি কখনো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না (*যে কারণে বাগানটা ধ্বংস হয়ে যাবে*)।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৪০-৪১

বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ইতোমধ্যেই কমতে শুরু হয়ে গেছে। এ কথা বলা যায় যে, শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে।

আজকের ইসলামি বিশ্বে ধনী ব্যক্তি ও গরীব ব্যক্তি

পার্থিব সম্পদের ব্যাপারে সূরা কাহাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। একদিকে যেমন সম্পদের প্রয়োজন ও উপযোগিতা রয়েছে, অপর দিকে এর মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভূত আকর্ষণ। তবে সম্পদ শেষ হয়ে যায়, অতএব এটাকে জীবনের সবকিছু মনে করা উচিত না। সূরা কাহাফের ভাষায় সৎকর্মই সময়ের পরীক্ষায় টিকে থাকে, তাই আমাদের উচিত সম্পদের পেছনে ছোটার চেয়ে ভাল আচরণের দিকে বেশী মনোযোগ দেয়া:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, তবে তোমার প্রতিপালকের নিকট সৎকর্মের ফল হবে স্থায়ী, এবং এই আশ্বাসের মধ্যেই রয়েছে প্রতিদানের সকল আশা।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৪৬

মানুষ সম্পদ এবং সন্তান চায়, কিন্তু এসবই ক্ষণস্থায়ী। যে জিনিষ এর চেয়ে উত্তম এবং কালজয়ী তা হলো সৎকর্ম। তাই শেষ যুগে পৃথিবী যত বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, বিশ্বাসীদের উচিত তত বেশী ন্যায়বান হবার চেষ্টায় মনোনিবেশ করা।

ধনী ও গরীব ব্যক্তিদ্বয়ের কাহিনী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় কিভাবে সম্পদের মাধ্যমে দাজ্জাল মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত করবে। সে সুদের ব্যবসা তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদেরকে ধনী করে দিবে যারা তাকে বাধা দিবে না। যারা তাকে প্রতিরোধ করবে, সে তাদেরকে দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিবে। এই কৌশল ব্যবহার করেই সে ইউরো-ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈলের স্বার্থে গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ইতোমধ্যেই এই কৌশল বহুল পরিমাণে সফল হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী আজ যারা ক্ষমতায় রয়েছে, তারা মূলত ধনী এবং তাদের ধনসম্পদ বেড়েই চলেছে। আর যারা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে।

আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ধনীরা সেই সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে যারা (পুঁজিবাদী) বিশ্ব শাসকদের সাহায্য প্রার্থী। অতএব দরিদ্র জনগোষ্ঠী কার্যত রাষ্ট্র পরিচালনা তথা ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। এই ব্যবস্থা ইসরাঈলের স্বার্থে ভালই কাজ করছে। রাসূল (সা:) দাজ্জাল সম্পর্কে ঠিক এই ভবিষ্যদ্‌বাণীই করেছেন:

নাউওয়াস বিন সাম'আন হতে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) একদিন সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে বললেন . . . তিনি বললেন: সে (দাজ্জাল) মানুষের কাছে আসবে এবং এক ভুল ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাবে; তারা তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার ডাকে সাড়া দিবে। সে তখন আকাশকে হুকুম দিবে, আর আকাশ থেকে বৃষ্টি শুরু হবে এবং শস্য উৎপাদন হবে। বিকালে তাদের গৃহপালিত পশু কুঁজ উঁচু করে তাদের কাছে আসবে। তাদের

স্তন দুধে ভরপুর থাকবে এবং তাদের পার্শ্ব ফুলে থাকবে। তারপর সে অন্য এক গোষ্ঠীর কাছে যাবে এবং তাদেরকে তার (ধর্মের) প্রতি আহ্বান জানাবে, কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। সুতরাং সে তাদের থেকে দূরে চলে যাবে। এরপর তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং তাদের কোন সম্পদ থাকবে না।

— সহীহ মুসলিম

সত্যি অবাক হতে হয় যে, ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি যতই গুরুত্বপূর্ণ ততই সেটা অবহেলিত। এই লেখকের অভিজ্ঞতায় খুব কম সংখ্যক মুসলমানদের এই বিষয়টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে, এর বড় কারণ হলো ইসলামের শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষাক্রমে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। আমরা আশা করি যে রিবা বা সুদের উপর আমাদের দু'টি বই (The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah *কুর'আন ও সুন্নায় সুদ নিষিদ্ধকরণ* এবং The Importance of the Prohibition of Riba in Islam *ইসলামে সুদ নিষিদ্ধকরণের গুরুত্ব*) পাঠকদেরকে এই বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়াও Islam and Money বা *ইসলাম ও অর্থ* সম্পর্কে একটি সেমিনারের রেকর্ডিং আমাদের ওয়েবসাইট www.imranhosein.org-এ দেখা যেতে পারে।

সম্পদ বস্তুবাদীদেরকে দূর্নীতিগ্রস্ত করে, আর যারা অন্যায় ভাবে সম্পদ উপার্জন করে তাদেরকে সম্পদের লালসা দুর্নীতিগ্রস্ত করে। এরূপ দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাতে শাসন ক্ষমতা চলে আসলে তারা গরীবদের উপর নিপীড়ন চালায়। সারা বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত মুসলিম সমাজ ইউরো-ইহুদি ইসরাঈল রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের বিরোধিতা করছে। অচিরে তারা উল্লেখযোগ্য ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সূরা কাহাফের কাহিনীর মধ্যে আমাদের জন্য এই আশার বাণী নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হবে, এবং ইসরাঈলের ক্ষমতা ও শক্তির দর্প চূর্ণ করবে। অতএব, সেই সময় আসছে যখন অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি সংঘর্ষ হবে। রাসূল (সা:) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যে, মুসলমানেরা একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে পবিত্রভূমি জেরুযালেমে অত্যাচারকে দমন করবে।

সম্পদ লুণ্ঠনকারী অভিজাত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনী এবং অন্যান্য রাষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ করে। তারা নিজ স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ইসরাঈলের সাথে হাত মিলিয়ে চলে। এটারই নাম দেয়া হয়েছে 'শান্তি প্রক্রিয়া'। তারা শক্তির ব্যবহার ও সুবিধা গ্রহণে অভ্যস্ত। অতএব ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায় আসা তাদের জন্য একটা ভীতিকর বিষয়। তারা জানে অনুরূপ বিপ্লবে ইরানের সম্পদ লুণ্ঠনকারী অভিজাত শ্রেণীর কি দশা হয়েছিল। অতএব এই আতংক তাদেরকে ইসরাঈলের সাথে সখ্যতা বজায় রাখতে বাধ্য করে। ইসলামের কঠোর এবং আপোষহীন বিচার-ব্যবস্থা তাদের ভীতির আরেক প্রধান কারণ।

এটাও সুস্পষ্ট যে, লুণ্ঠনকারী ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে কখনই পবিত্রভূমিকে অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। একই ভাবে এটাও স্পষ্ট যে, তাদের দরিদ্র ভাইয়েরা ঐ সংঘর্ষে আনন্দের সাথে যোগদান করবে।

সম্প্রতি ফিলিস্তিনের নির্বাচনে সূরা কাহাফে বর্ণিত ধনী ব্যক্তি ও গরিব ব্যক্তির কাহিনীর এই দিকটি নাটকীয় ভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে গরিব লোকেরা ইসরাঈলের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইসলামি প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনে হামাসকে ভোট দিয়েছে।

সূরা কাহাফে বর্ণিত গরিব ব্যক্তিটি সেই ধনী ব্যক্তিকে যা বলেছিল, সেটাই ফিলিস্তিনি গরিবদের আশা ও শক্তির উৎস:

. . . إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

" . . . তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার চাইতে কম দেখলে।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৩৯

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

"আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে (*শাস্তি স্বরূপ*) আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৪০

যখন সম্পদ হৃদয়কে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, তখন আরও একটি জটিলতা দেখা দেয়। এরূপ ব্যক্তি অন্তর থেকে অন্ধ হয়ে যায়, ফলে সে কুর'আনে দেয়া সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। এই ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ কি করবেন তাও সূরা কাহাফে বলা হয়েছে:

. . . إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ
وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

" . . . আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি যেন তারা কুর'আনকে বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি, আপনি তাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৫৭

যে সকল ঈমানদার ব্যক্তি এই বইটি পড়বেন তারা একটু অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করলেই "আন্তরিক ভাবে অন্ধ"-দেরকে চিনতে পারবেন, অর্থাৎ, তাদেরকে চিনতে পারবেন যারা ইসলামের প্রকৃত পন্ডিত এবং আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের উপদেশকে অগ্রাহ্য করে।

এদের পরিচয় হলো এই, যে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী ব্যবহার ক'রে (প্রয়োজনে টাকা বিলিয়ে) নিজেদেরকে মুসলিম সমাজের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এরাই উৎসাহের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপের ইহুদি-খ্রিষ্টান আঁতাতের যুদ্ধকে সমর্থন যোগায়। যদিও তারা নিজেদেরকে ইসলামের নেতা হিসেবে দাবী করে, তথাপি তারা ইসলামকে ত্যাগ করেছে এবং ইহুদি-খ্রিষ্টান মৈত্রীর শাসন ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে। এ বিষয়ে কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

"হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"

— সূরা মায়েদা, ৫:৫১

৭ § মূসা এবং খিযিরের রূপক-কাহিনী

মুসা (আ:) এবং খিযির (আ:)-এর সাক্ষাতের কাহিনীতে সূরা কাহাফ ব্যক্ত করেছে যে, দাজ্জাল 'এক চোখ' দিয়ে দেখে, কিন্তু সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীরা 'দুই চোখ' দিয়ে দেখে, অর্থাৎ তাদের জ্ঞানের উৎস দু'টি। প্রথমটি হলো ইলমে জাহির বা বাহ্যিক জ্ঞান, যা নির্ভর করে বস্তুজগতের অনুসন্ধান ও যুক্তিপ্রয়োগের উপর, যাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা হয়, এবং যার গন্ডি অত্যন্ত সীমিত। দ্বিতীয়টি হলো ইলমে বাতিন বা তাত্ত্বিক জ্ঞান, যাকে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞানের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে যা বস্তু জগতের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই জ্ঞান সাধারণ ভাবে স্বজ্ঞা-অর্জিত, তবে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ঐশী উপহার হিসেবেও আসতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই এই জ্ঞানের কোনো সীমা নেই, এটি অক্ষয় এবং সময়ের গন্ডি থেকে মুক্ত।

রাসূল (সা:) এরূপ জ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন যে, ঈমানদার ব্যক্তিকে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে যে জ্ঞান দেয়া হয়, তা ওনার পরেও নবুয়তের শেষ অংশ হিসেবে পৃথিবীতে থাকবে। এখানে হাদীসটি দেয়া হলো, যা বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে:

ওবাদা বিন সামিত (রা:) থেকে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন, একজন বিশ্বস্ত ঈমানদারের ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

— সহীহ বুখারী

আনাস বিন মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র নবী (সা:) বলেছেন, একজন ন্যায়নিষ্ঠ ঈমানদার ব্যক্তির ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

— সহীহ বুখারী

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) বলেছেন, একজন বিশ্বাসী ঈমানদার লোকের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

— সহীহ বুখারী

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত: আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:)-কে বলতে শুনেছি, একটি ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

— সহীহ বুখারী

ইয়াহিয়া হতে, মালিক হতে, যায়েদ বিন আসলাম হতে, আতা বিন ইয়াসার (রা:) হতে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:) বলেছেন, আমার পরে নবুয়তের যা রয়ে যাবে সেটা হচ্ছে 'মুবাশ্‌শিরাত'। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'মুবাশ্‌শিরাত' কি? রাসূল (সা:) বললেন, সত্য

স্বপ্ন যা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দেখে, বা তাকে দেখানো হয় — আর সেটা হলো নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

— মুওয়াত্তা ইমাম মালিক

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:)-কে বলতে শুনেছি, নবুয়তের কিছুই অবশিষ্ট নেই 'আল-মুবাশ্‌শিরাত' ছাড়া। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন 'মুবাশ্‌শিরাত' কি? রাসূল (সা:) প্রতিউত্তরে বললেন, ভাল অথবা সত্য স্বপ্ন (যা সুসংবাদ বহন করে)।

— সহীহ বুখারী

ধর্মীয়গ্রন্থের মাধ্যমেও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। ঐশী গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে: Torah (তৌরাত), Psalms (যবুর), Gospel (ইন্‌জিল) এবং কুর'আন।

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে মোটামুটি ভাবে ইলমে বাতিনকে জ্ঞান হিসেবে স্বীকার করা হয় না। এই বিষয়ে Dreams in Islam নামক আমাদের বইয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা সেই অংশটি এই বইয়ের প্রথম পরিশিষ্টে সংযোজন করেছি। Iqbal, the Sufi Epistemology and the End of History নামক আমাদের এক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। (দেখুন আমাদের প্রবন্ধের সংকলন: Signs of the Last Day in the Modern Age)। তবে, এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে ডাঃ মুহাম্মদ ইকবালের Reconstruction of Religious Thought in Islam বইটির প্রথম দু'টি অধ্যায়ে। বইটি পড়া যেতে পারে www.allamaiqbal.com/works/prose/english/reconstruction ওয়েবসাইটে।

সূরা কাহাফে বর্ণিত মূসা (আ:) এবং খিযির (আ:)-এর গল্পটি দাজ্জালের যুগে ইলমে বাতিনের পরম গুরুত্বকে ব্যক্ত করে . . . "সে তার সাথে আনবে নদী এবং আগুন, তবে তার নদী হবে আগুন এবং আগুন হবে নদী":

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা:) হতে বর্ণিত: সুবাই বিন খালিদ বলেছেন, "তুস্তার (Tustar) বিজয়ের সময় আমি কুফায় গেলাম। আমি সেখান থেকে কিছু খচ্চর যোগাড় করলাম। কুফার মসজিদে প্রবেশ করে কিছু খাটো লোককে দেখলাম। তাদের মাঝে একজন ছিল, যাকে দেখে বুঝা যাচ্ছিল যে সে হেজাযের লোক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কে? লোকেরা আমার দিকে ভ্রুকুটির সাথে তাকালো, আর বলল, তুমি তাকে চিন না? তিনি হুযাইফা বিন ইয়ামান, নবী (সা:)-এর সাহাবী। তারপর হুযাইফা বললেন: লোকেরা আল্লাহ্‌র নবীকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, আর আমি তাকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। লোকেরা তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো। তিনি বললেন: আমি জানি কেন তোমরা এটাকে অপছন্দ করো। আমি এক সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞেস করলাম, অতীতের মত ভবিষ্যতেও কী অকল্যাণ ও দুর্যোগ আসবে? তিনি বললেন, হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলি থেকে কিভাবে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, তরবারির

মাধ্যমে (অর্থাৎ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তারপর কি ঘটবে? তিনি বললেন, যদি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র কোন খলীফা থাকেন, আর তিনি তোমাদের পিঠের চামড়া তুলে ফেলেন, বা তোমাদের সম্পত্তি নিয়ে নেন, তারপরও তোমরা তাকে মান্য করবে, নতুবা গাছের গুঁড়ি ধরে মৃত্যু বরণ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি ঘটবে? তিনি বললেন, *তারপর দাজ্জাল আসবে, তার সাথে থাকবে নদী আর আগুন। যে তার আগুনে পড়বে সে নিশ্চয় তার পুরস্কার পাবে, আর তার বোঝা সরিয়ে দেয়া হবে; কিন্তু যে তার নদীতে পড়বে, তার বোঝা তাকে বইতে হবে আর তার পুরস্কার কেড়ে নেয়া হবে।* আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এর পর কি ঘটবে? তিনি বললেন, শেষ সময় চলে আসবে।"

— সুনান আবু দাউদ

উপরের হাদীসটির নিহিতার্থ এই যে, দাজ্জালের যুগে বাহ্যিক চিত্র আর বাস্তব চিত্র একে অপরের বিপরীত হবে। নদী হলো জান্নাতের প্রতীক, কিন্তু প্রতারণার সাথে দাজ্জাল সেটাকে আগুন হিসেবে দেখাবে। কেবল মাত্র যাদেরকে আল্লাহ্ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়েছেন তারাই দাজ্জালের যুগে 'নদী' এবং 'আগুনের' আসল স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হবে। তারা সত্য জ্ঞানের সাহায্যে দাজ্জালের আক্রমণকে চিনতে পারবে, এবং প্রতারিত হবে না। একারণেই, নবী মুহাম্মদ (সা:) প্রায়শ প্রার্থনা করতেন: "হে আল্লাহ্, দয়া করে আমাকে সব কিছুর আসল রূপ দেখাও (যেন আমি সেগুলির বাহ্যিক চেহারা দেখে প্রতারিত না হই)।"

বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিশ্বাসীদের অন্তরে সরাসরি প্রবেশ করবে। যখন ঈমানদার ব্যক্তি কুর'আনের অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং ঐশ্বরিক বাণীর অভ্যন্তরীণ সত্যটি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে, তখন সে অবিনশ্বর কুর'আন থেকে উন্মোচিত জ্ঞান দ্বারা আর্শীবাদ প্রাপ্ত হবে। সূরা কাহাফের আক্ষেপ যে, মানুষ সেই পথে পা বাড়ায় না যে পথে গেলে কুর'আনের অবিনশ্বর জ্ঞান দ্বারা সে লাভবান হতে পারে:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

"নিশ্চয় আমি এই কুর'আনে মানুষের জন্যে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণীকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয় (*ফলতঃ সে সেই অবিনশ্বর জ্ঞান লাভের জন্য কুর'আনের দিকে মুখ ফেরায় না*)।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৫৪

মহান আল্লাহ্‌র এই সতর্কবাণী পবিত্র কুর'আনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, অহংকার, বিবাদপ্রিয় স্বভাব এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ কুর'আনকে অস্বীকার করে, এবং সেটিকে জ্ঞানের আধার হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে।

অতএব সত্যকে জানার জন্য কুর'আনের অধ্যয়নে বিনয়ী মনোযোগ এবং আন্তরিক উৎসাহের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে মানুষ অবিনশ্বর জ্ঞানের উৎস এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে পবিত্র কুর'আনের দাবীকে অবাধ তর্কের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। একই সাথে বাহ্যিক উৎস থেকে আহরিত জ্ঞান ইন্টার্নেটের কল্যাণে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে গেছে। ফলে মানুষের অন্তর ঐশী জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে।

সূরা কাহাফে বর্ণিত মূসা (আ:) এবং খিযির (আ:)-এর কাহিনী পরিষ্কার ভাবে ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যকে ফুটিয়ে তুলেছে যাদের একজন শুধু বাহ্যিক দিকটা দেখে, অর্থাৎ এক চোখ দিয়ে দেখে; আর অপর জন অন্তর বাহির দু'টাকেই দেখে, অর্থাৎ দুই চোখ দিয়ে দেখে।

খিযির মানে সবুজ। তাঁর এই নাম কিভাবে হলো তার ব্যাখ্যা একটি হাদীসে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন, তাঁর নাম খিযির হয়েছে কারণ তিনি একবার এক উদ্ভিদবিহীন জমিতে গিয়ে বসলেন, তারপর সেখানে গাছপালা গজিয়ে উঠে সব সবুজ হয়ে গেল।

— সহীহ বুখারী

আমার ধারণা, তার নামের তাৎপর্য এই যে, তাকে দুই চোখ দিয়ে দেখার বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, ফলে তার জ্ঞান ছিল চিরসবুজ, যার মধ্যে অন্তরকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল। এধরনের জ্ঞান মৃত হৃদয়কে নতুন জীবন দান করে। আর চির বসন্তের মত এধরনের হৃদয় হতে অফুরন্ত জ্ঞানের উদ্ভব হতে থাকে।

মুসা (আ:) এবং খিযির (আ:)-এর গল্পটি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সূরা কাহাফে বর্ণিত এই কাহিনীটি বুঝতে হলে হাদীসটি জানার দরকার। হাদীসটি এই:

উবাই বিন কা'ব (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা:) বলেছেন: একদিন মূসা (আ:) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো: "মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী জ্ঞানী কে?" মূসা (আ:) বললেন: "আমি।" একথা বলার জন্য আল্লাহ্-তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে দিলেন যে আল্লাহ্‌ই সকল জ্ঞানের উৎস। আল্লাহ্ তাঁকে বললেন: "দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দাকে পাবেন যে আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী।" একথা শুনে মূসা (আ:) বললেন: "হে আল্লাহ্, আমি তাঁর সাথে কিভাবে দেখা করতে পারি?" আল্লাহ্ বললেন: "বড় একটা থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানে তাঁকে পাবেন।"

মূসা (আ:) নির্দেশমত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা বিন নূনও ছিল। পথিমধ্যে তাঁরা একটি প্রস্তর খন্ডের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন মাছটি থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি

একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে গেল। আল্লাহ্-তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন, ফলে সুড়ঙ্গটি বক্র আকারের হয়ে গেল। রাসূল (সা:) সেটা হাত দিয়ে দেখালেন।

তাঁরা গোটা রাত চলতে থাকলেন, পরের দিন মূসা (আ:) তাঁর ভৃত্যকে বললেন: আমাদের খাবার আন, এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আসলে মূসা (আ:) সেই কাঙ্খিত স্থান পার হবার পর থেকেই ক্লান্তি বোধ করেছিলেন।

ভৃত্য তাঁকে বলল: আপনি জানেন, আমরা যখন ঐ পাথরের কাছে বসেছিলাম, তখন মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম (শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল), আর ওটা অদ্ভূত ভাবে সাগরে চলে গেল। ঐ পাথরের কাছেই মাছটির জন্য একটি রাস্তা ছিল, আর সেটাই তাঁদেরকে অবাক করে দিল। মূসা (আ:) বললেন: ঐ জায়গাই তো আমরা খুঁজছিলাম।

দুজনেই তখন সেই দিকে ফেরত চললেন। পাথরের কাছে পৌঁছে দেখলেন এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মূসা (আ:) তাঁকে সম্বোধন জানালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমার দেশে লোকেরা কিভাবে সম্বোধন জানায়? মূসা (আ:) বললেন: আমি মূসা। তিনি বললেন: বনী ইসরাঈলের মূসা? মূসা (আ:) বললেন: হ্যাঁ। তারপর বললেন: আমি আপনার কাছে এসেছি আপনার কাছ থেকে কিছু শেখার জন্য যা আল্লাহ্ আপনাকে শিখিয়েছেন। তিনি বললেন: হে মূসা, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে রাখতে পারবেন না; আমাকে আল্লাহ্ এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনি জানেন না; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মূসা (আ:) বললেন: আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি? তিনি বললেন: কিন্তু আপনি তো আমার সাথে ধৈর্য ধরে রাখতে পারবেন না, কারণ আপনি কিভাবে ঐসব ব্যাপারে ধৈর্য ধরে রাখতে পারবেন যা আপনার বোধশক্তির ঊর্ধ্বে? মূসা (আ:) বললেন: আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনাকে অমান্য করব না।

দুজনেই সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। একটি নৌকা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা মাঝিদেরকে নৌকায় নেবার জন্য আবেদন করলেন। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেলল, তাই তাঁদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় উঠার পরে একটা চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক পাশে বসল আর তার ঠোঁটটা দু-এক বার পানিতে ডুবাল। খিযির মূসাকে বললেন: মূসা, এই চড়ুই সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি কমিয়ে দিয়েছে, আমার আর আপনার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞান থেকে ততটুকুও কমাতে পারে নি। তারপর হঠাৎ খিযির একটা কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। মূসা (আ:) এটা দেখে বললেন: আপনি এ কি করলেন? তারা কোন ভাড়া না নিয়ে আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে, আর আপনি এর মধ্যে ফাটল তৈরী করে দিলেন, এর ফলে যাত্রিরা সব ডুবে যাবে! আপনি নিশ্চয় একটা জঘন্য কাজ করেছেন।

খিযির (আ:) বললেন: আমি কী আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে রাখতে পারবেন না? জবাবে মূসা (আ:) বললেন: ভুলে যাওয়ার জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন

না, আর আমার ভুলের কারণে আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না। অর্থাৎ, মূসা (আ:)-এর প্রথম অজুহাত ছিল যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

সাগর থেকে মাটিতে নেমে এসে তাঁরা একটি বালকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বালকটি অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করছিল। খিযির বালকটির মাথা ধরে এভাবে আলাদা করে দিলেন। (উপ-বর্ণনাকারী সুফীয়ান আঙ্গুলগুলি একত্র করে দেখালেন, ঠিক যেমন করে ফল পাড়তে হয়)। মূসা (আ:) তাঁকে বললেন: আপনি কি একটা নিষ্পাপ মানুষকে মেরে ফেললেন যে কোন মানুষকে হত্যা করে নি? আপনি আসলেই একটা বীভৎস কাজ করেছেন? খিযির (আ:) বললেন: আমি কী আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে রাখতে পারবেন না? মূসা (আ:) বললেন: এরপর যদি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি, আপনি আমাকে ছেড়ে যেতে পারেন। আমি অনেক অজুহাত দেখিয়ে ফেলেছি।

এরপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। একটি গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদেরকে মেহমান হিসেবে নিতে অস্বীকার করল। তারপর তাঁরা একটা দেয়াল দেখলেন যেটা কাত হয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। খিযির দেয়ালটিকে ছোঁয়া মাত্রই সেটা সোজা হয়ে গেল। (উপ-বর্ণনাকারী সুফীয়ান হাত দিয়ে দেখালেন কিভাবে খিযির হাতটা উপরের দিকে বুলিয়েছিলেন)। মূসা (আ:) বললেন: এই লোকগুলি আমাদেরকে খাবার দিল না, মেহমান হিসেবে নিল না, আর আপনি তাদের দেয়াল মেরামত করে দিলেন। আপনি তাদের কাছে এর মজুরি চাইতে পারতেন।

খিযির বললেন: এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। আমি এবার সে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেবো যেগুলিতে আপনি ধৈর্য ধরে রাখতে পারেন নি।

এরপর রাসূল (সা:) বললেন: আহা, যদি মূসা (আ:) আর একটু ধৈর্য রাখতে পারতেন তাহলে আল্লাহ্ তাঁদের কাহিনীর আরও কিছু আমাদেরকে জানাতেন। (উপ-বর্ণনাকারী সুফীয়ানের ভাষায়: রাসূল (সা:) বললেন: আল্লাহ্ মূসা (আ:)-এর উপর রহমত নাজিল করুন! তিনি যদি আর একটু ধৈর্য ধরে রাখতে পারতেন, তাহলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম)।

— সহীহ বুখারী

এখন আমরা ফিরে যাব সূরা কাহাফে বর্ণিত মূসা এবং খিযিরের রূপক-কাহিনীর দিকে। কাহিনীটি শুরু হয়েছে ৬০ নং আয়াতে এবং শেষ হয়েছে ৮২ নং আয়াতে:

আয়াত-৬০

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

"স্মরণ কর! যখন মূসা তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন: দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামব না, আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।"

আয়াত-৬১

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

"যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছলেন, তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। ওটা সুড়ঙ্গের মত পথ করে সাগরে নেমে গেল।"

আয়াত -৬২

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

"যখন তাঁরা সেই স্থানটি অতিক্রম করে গেলেন মূসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন: আমাদের নাশতা আন। আমরা তো এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

আয়াত -৬৩

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ
وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

"তখন সে বলল: আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তর খন্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম; শয়তানই আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনক ভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।"

আয়াত-৬৪

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

"মুসা বললেন, আমরা তো এই স্থানটিই খুজছিলাম, অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন।"

আয়াত-৬৫

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

"অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যাঁকে আমি আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও যাঁকে আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছিলাম।"

আয়াত-৬৬

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

"মুসা তাঁকে বললেন, আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?"

আয়াত -৬৭

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

"তিনি (খিযির) বললেন: তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।"

আয়াত-৬৮

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

"যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয়, সে বিষয় তুমি ধৈর্যধারণ করবে কেমন করে?"

আয়াত-৬৯

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾

"মূসা বললেন: আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করবো না।"

আয়াত-৭০

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

"তিনি (খিযির) বললেন: আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ কর-ই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে সে সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলি।"

আয়াত-৭১

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

"অতঃপর তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন, পথিমধ্যে যখন তাঁরা নৌকায় আরোহণ করলেন তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন; মূসা বললেন: আপনি কি এর অরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এতে ছিদ্র করে দিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।"

আয়াত- ৭২

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

"তিনি (খিযির) বললেন: আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না?"

আয়াত-৭৩

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

"মুসা বললেন: আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।"

আয়াত-৭৪

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

"অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন, অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন: আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করে দিলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই ? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।"

আয়াত-৭৫

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

"তিনি (খিযির) বললেন: আমি কি বলি নাই যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?"

আয়াত-৭৬

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

"মূসা বললেন: এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না, আপনার কাছে আমার ওজর-আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে।"

আয়াত-৭৭

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

"অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন, অবশেষে এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো; অতঃপর তাঁরা সেখানে একটি পতনপ্রায় প্রাচীর দেখতে পেলেন, এবং সেটিকে তিনি (খিযির) সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মূসা বললেন: আপনি তো ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন।"

আয়াত- ৭৮

قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

"তিনি (খিযির) বললেন: এখানেই আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ কার্যকর হবে। এখন যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরে রাখতে পারনি, আমি তার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি।"

আয়াত-৭৯

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

"নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে) সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো। আমি ইচ্ছা করলাম সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই, কারণ তাদের পেছনে ছিল এক বাদশাহ, সে বল প্রয়োগ করে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত।"

আয়াত-৮০

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

"আর বালকটির পিতা মাতা ছিল ঈমানদার। আমরা আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফ্‌রি দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।"

আয়াত-৮১

فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

"অতঃপর আমরা চাইলাম যে, তাদের পালনকর্তা যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন যে হবে তার চাইতে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।"

আয়াত-৮২

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ
ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

"আর ঐ প্রাচীর - ওটা ছিল নগরের দুইজন এতিম বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। তাই তোমার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক; আমি নিজ মতে এটা করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলে, এই হলো তার ব্যাখ্যা ।

— সূরা কাহাফ, ১৮:৬০-৮২

অন্তরের অন্ধত্বের চরম পরিণাম ও এযুগের মুসলিমদের জন্য খিযিরের শিক্ষা

সূরা কাহাফ, যা আমাদেরকে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা করে, তার এই গল্পের নিহিতার্থ হলো যে, দাজ্জালের যুগে এমন এক জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাব হবে যা কেবলমাত্র বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিবে। যারা এই ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানতত্ত্বের গুণগ্রাহী হবে, তারা আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে অন্তর থেকে অন্ধ হয়ে যাবে। জ্ঞান অর্জনের উৎস শুধু তাই নয় যা বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা যায়, বা গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা যায়। নিজের উপর এই সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে নিলে মানুষ একচোখা হয়ে পড়ে। অন্তর থেকে অন্ধ ব্যক্তি অন্তর থেকে কালাও হয়ে পড়ে, ফলে তার মন থেকে আল্লাহ্‌র যিকির চলে যায়। ধর্ম তখন হয়ে দাঁড়ায় এক নামসর্বস্ব প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা। কুর'আন এই অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে, যা দাজ্জালের যুগকে চিনতে সাহায্য করে:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ
أُولَـٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা তারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা তারা দেখেনা, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল, অমনোযোগী।"

— সূরা আ'রাফ, ৭:১৭৯

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

"আমি ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমনিভাবে তারা এর প্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি, এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিবো।"

— সূরা আন্‌'আম, ৬:১১০

خَتَمَ اللَّـهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

"আল্লাহ্ তাদের অন্তর আর কানের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

— সূরা বাকারা, ২:৭

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

"যাদের চোখের উপর পর্দা থাকায় আমাকে স্মরণ করত না, ও তারা শুনতেও অক্ষম ছিল।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:১০১

দাজ্জালের যুগ হবে পদার্থ বিজ্ঞানের যুগ, অর্থাৎ যে যুগে বিশ্বাস করা হবে যে জ্ঞান কেবলমাত্র বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আসতে পারে। এই যুগ জ্ঞানকে এতটাই ধর্মবিমুখ করে দিবে যে মনে হবে বস্তু জগতের বাইরে আর কিছুই নেই। এটাই হবে বস্তুকেন্দ্রীক কুফ্‌র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা এখন এই ধরনের কুফ্‌রির যুগে বাস করছি, যাকে মহা-কাফের দাজ্জালের যুগ বলা হয়।

মুসা (আ:) তিন বারই বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তিন বারই তিনি ভুল প্রমাণিত হয়েছিলেন। নৌকাটি নষ্ট করে দেয়ায় তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। বাস্তবে এই ক্ষতি সাধন নৌকাটিকে বাদশাহ কর্তৃক কেড়ে নেয়া থেকে রক্ষা করেছিল। এই ঘটনার মধ্যে যে চরম অর্থ নিহিত রয়েছে তা হলো, যদি কেউ এধরনের ভুল করে, তাহলে সে দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মুসলমানদের উচিত খিযির (আ:)-এর মত একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন পথপ্রদর্শক খুঁজে নেয়া, এবং তার নির্দেশ মেনে চলা।

খিযির (আ:) শুধুমাত্র যে সেই গরীব মাঝির নৌকাকে রক্ষা করেছিলেন তাই নয়, *তিনি এটাও বুঝিয়ে দিলেন যে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের যুগে নিজের মাল-সম্পত্তিকে লোভী শাসক শ্রেণীর কুনজর থেকে রক্ষা করতে হলে সেগুলিকে সেই ভাঙ্গা নৌকার মত আকর্ষণহীন করে রাখতে হবে। এছাড়া আইন সম্পর্কেও তিনি সজাগ করে দিলেন যে নৈতিক আইন, দেশের আইনসহ সকল আইনের উর্ধ্বে, তাই নৈতিক আইন মানতে গিয়ে যদি দেশের আইনকে অমান্য করতে হয়, তাহলে ঈমানদার ব্যক্তির তাই করা উচিত হবে।*

মুসা (আ:) বালকের হত্যার নিন্দা করলেন। আসলে বালকটি বড় হয়ে কাফির হয়ে যেত এবং তার কুফ্‌র তার পিতামাতার ঈমানের প্রতি হুমকি হয়ে উঠত। বালককে হত্যা করে খিযির একজন কাফিরকে শেষ করলেন, এবং এই আশায় তার বাবা-মার ঈমানকে বাঁচালেন যে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন এক সন্তান দেবেন যে তাদের জন্য আনন্দ ও সুখের উৎস হবে।

খিযির (আ:) শুধু যে বালকের পিতা-মাতার ঈমান রক্ষা করলেন তাই নয়, *তিনি ঈমানদারদেরকে এটাও জানিয়ে দিলেন যে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল আনিত বর্তমান স্রষ্টাবিমুখ যুগে তাদেরকে খিযিরের উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে। তাদের উচিত হবে কুফ্‌রের জগত থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া এবং দোয়া করা যেন তাদেরকে এর চেয়ে নিরাপদ জগত দেয়া হয় যেখানে তারা ঈমান রক্ষা করে চলতে পারবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, আভাস পাওয়া মাত্রই কুফ্‌রকে কুঁড়িতে বিনষ্ট করতে হবে, যেন সেটা পূর্ণতা অর্জন করে চেপে না বসতে পারে।*

দেয়ালটির সংস্কারকে মূসা (আ:) সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে দেখলেন, এমন এক অনুগ্রহ যা তাদের পাওনা ছিল না, কারণ তারা ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত মুসাফিরদের সাথে আতিথেয়তা প্রদর্শন করেনি। এজন্য তিনি মনে করেছিলেন যে, তাদের কাছ থেকে অন্তত পারিশ্রমিক আদায় করা যেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, তারা

যেন দেয়ালটির নীচে রক্ষিত সম্পত্তির সন্ধান না পায়, খিযির (আ:) সেই বন্দোবস্ত করে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুই এতিম যেন বড় হয়ে সেই সম্পত্তি থেকে উপকৃত হয়।

খিযির (আ:) কেবল সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য দেয়ালটির মেরামত করলেন তাই নয়। *এর মধ্যে সেই সময়ের জন্য এক জরুরি বাণী রয়েছে যখন মু'মিনরা ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল আনিত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মুখামুখি হবে। যখন তারা দেখবে ইসলামের দালান ভেঁঙ্গে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, তখন খিযির (আ:)-এর অনুকরণে তারা সেটির মেরামত করবে যেন পরবর্তী বংশধরদের হাতে ইসলামের জ্ঞান-সম্পদ সুরক্ষিত অবস্থায় তুলে দিতে পারে। আমার মনে হয়, যে দ্রুতগতিতে ইসলামকে আক্রমণ করা হচ্ছে, সেটা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যন্ত এলাকায় ছোট ছোট মুসলিম গ্রাম তৈরী করা। এই গ্রামগুলি আদতে সেই দেয়ালের মত হবে যার নীচে এতিমদের সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, আল্লাহ্ নিজেই এরকম গ্রামগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, যেমন তিনি সূরা কাহাফের রূপক-কাহিনীর দেয়ালটির বেলায় করেছিলেন।*

দাজ্জাল, মুসা, এবং খিযির

দাজ্জাল কে? ইসলামে দাজ্জালের বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? কেন সে আল-মাসীহ আদ-দাজ্জাল (অর্থাৎ, ভণ্ড-মাসীহ বা যীশুর শত্রু বা Anti-Christ) নামে পরিচিত? এবং কীভাবে সূরা কাহাফে দেয়া মূসা ও খিযিরের কাহিনী দাজ্জালের বিষয়টির সাথে জড়িত? এখন আমরা এই রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলির আলোচনা করব।

দাজ্জালের বিষয়টির গুরুত্ব এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (সা:) নিজেই মু'মিনদেরকে নামাযের মধ্যে দাজ্জাল থেকে আশ্রয় চেয়ে দোয়া করতে বলেছেন। আয়েশা, আবু হুরায়রা এবং আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত হাদীসগুলি বিবেচনা করুন:

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত: "আল্লাহ্র রাসূল (সা:) নামাযের মধ্যে দোয়া করতেন: ও আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাই, ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের ফেৎনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেৎনা হতে আশ্রয় চাই। ও আল্লাহ্, আমি পাপ ও ঋণ হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।"

— সহীহ বুখারী

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: "আল্লাহ্র নবী (সা:) প্রার্থনা করতেন এই বলে যে: ও আল্লাহ্, আমি আপনার কছে আশ্রয় প্রর্থনা করি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের আগুন হতে, জীবন ও মৃত্যুর দুঃখ-কষ্ট হতে, এবং ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের ফেৎনা হতে।"

— সহীহ বুখারী

আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত: "আল্লাহ্র রাসূল (সা:) প্রার্থনা করার সময় বলতেন: ও আল্লাহ্, আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি কৃপণতা, অলসতা, বার্ধক্যের দুর্বলতা, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফেৎনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেৎনা হতে।"

— সহীহ বুখারী

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত: "আমি শুনেছি রাসূল (সা:) নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে দাজ্জালের ফেৎনা হতে আশ্রয় প্রর্থনা করেছেন।"

— সহীহ বুখারী

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত: "রাসূল (সা:) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাশাহুদ শেষ করে নেয় (যার পর নামায শেষ হয়ে যায়), সে যেন আল্লাহ্‌র কাছে চারটি ফেৎনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যথা: জাহান্নামের শাস্তি হতে; কবরের আজাব হতে; জীবন ও মৃত্যুর যন্ত্রণা হতে; এবং ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের চক্রান্ত হতে।"

— সহীহ মুসলিম

চিন্তার বিষয় এই যে মুসলমান দাজ্জালের চক্রান্ত থেকে নিরাপত্তা পাবার জন্য নামাযের ভেতরে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইবে, অথচ দাজ্জাল সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূল কুর'আন ও হাদীসে যা কিছু বলেছেন সেবিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞ থাকবে, এ কিভাবে সম্ভব? বর্তমান অবস্থা কিন্তু ঠিক তাই, অর্থাৎ মুসলমান ডুবে আছে, হয় অজ্ঞতায় না হয় বিভ্রান্তিতে।

নবী (সা:) মু'মিনকে কেবল দাজ্জাল থেকে আশ্রয় চাইতেই বলেননি, তিনি তাকে দাজ্জাল থেকে দূরে থাকতেও বলেছেন, কারণ সে হবে খুবই ভয়ঙ্কর। দাজ্জালের ভয়ঙ্করতার আসল রূপও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। সেটা কী? সেটা হলো দাজ্জালের যুগে মানুষ পৃথিবীর আসল চেহারা বুঝতে পারবে না, কারণ দাজ্জালের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে 'সত্য' ও 'সত্য ধর্ম'-কে বুঝতে পারার ক্ষমতাকে বিকৃত করা। মানুষ অন্ধের মত ও একগুঁয়েমির সাথে মিথ্যাকে এবং বিকৃত সত্যকে আঁকড়ে ধরবে, আর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে। নবী (সা:) বলেছেন যে, দাজ্জালের আক্রমণ হবে বিশ্বব্যাপী, অর্থাৎ গোটা মানবজাতি হবে এর লক্ষ্য:

ইমরান বিন হোসেন (রা:) হতে বর্ণিত: "রাসূল (সা:) বলেছেন: যে দাজ্জালের সংবাদ পাবে, সে যেন তার থেকে দূরে চলে যায়। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, মানুষ তার কাছে আসবে এই মনে করে যে তারা তো ঈমানদার, কিন্তু তারা তাকে অনুসরণ করবে একারণে যে, দাজ্জাল তাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দেবে।"

— সুনান আবু দাউদ

আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত: "রাসূল (সা:) বলেছেন: মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর প্রত্যেক শহরে দাজ্জাল প্রবেশ করবে। মক্কা ও মদীনা শহর দু'টির প্রবেশের সকল পথে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে পাহারায় থাকবে। তারপর মদীনায় তিন বার ভূকম্প হবে। এবং আল্লাহ্ এখান থেকে সকল অবিশ্বাসী ও মুনাফেককে বের করে দিবেন।"

— সহীহ বুখারী

দাজ্জালের ফেৎনার ভয়ঙ্করতার অনুমান করতে হলে নবী (সা:)-এর সেই বাণীকে স্মরণ করতে হয় যেখানে তিনি বলেছেন: আদম (আ:) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত গোটা সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফেৎনা হবে দাজ্জাল।

তিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন দাজ্জালের লক্ষ্যপূরণের আর বেশী বাকি থাকবে না, তখন তাঁর বংশধরদের মধ্য হতে ইমাম মাহদীর আগমন হবে। দাজ্জাল তাঁকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তখন ঈসা (আ:)-কে দুনিয়ায় ফেরত পাঠাবেন, এবং তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। সেই সাথে অবসান হবে এক দীর্ঘ, ভীতিপ্রদ, অশুভ কালো রাত্রির।

আমরা "পবিত্র কুর'আনে জেরুযালেম" গ্রন্থে বলেছি যে, সেই সময় খুব নিকটে যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ:) ফিরে আসবেন। এর মানে এই যে, আজ থেকে কিছুকাল আগেই দাজ্জালকে পৃথিবীতে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

লেখক এবিষয়ে নিশ্চিত যে, দাজ্জালই ধর্মহীন বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার মূল উদ্ভাবক। এই অবক্ষয়ী সভ্যতা আধুনিক চিন্তাধারা ও জীবনধারাকে নিত্যনতুন রূপে গঠন করে চলেছে। এটাই সেই সভ্যতা যার সম্পর্কে রাসূল (সা:) সতর্ক করে দিয়েছেন। এই বইটিতে যে সকল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য হলো যে, দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সূরা কাহাফকে শুধুমাত্র তেলাওত করলে চলবে না, অধ্যয়নও করতে হবে।

এই বইটি সাবধান করে দিচ্ছে যে, মুসলিমসহ অধিকাংশ মানবজাতি নির্বিচারে ইউরো-খ্রিষ্টান এবং ইউরো-ইহুদিদের আধুনিক জীবনধারায় মজে গেছে। এদের প্রতারণার ফাঁদে ভাল ভাল বিশ্বাসীরাও আটকে যেতে পারে। আমরা এমন যুগে বাস করছি যখন মুসলিম জনসাধারণের ঈমান ইতোমধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। এই দুর্যোগের মুকাবিলার প্রধান উপায় হলো সূরা কাহাফের দিকে মনোযোগ ফেরানো এবং সেটাকে ব্যবহার করে বর্তমান পৃথিবীকে বুঝতে চেষ্টা করা।

দাজ্জালের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব — সে কেবল এক চোখে দেখে

মহানবী (সা:) ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন। সে কেবল এক চোখ দিয়ে দেখে, অর্থাৎ শুধুমাত্র *ইলমে যাহির* বা বাহ্যিক জ্ঞান তার আয়ত্তে রয়েছে। তার ডান চোখ অন্ধ, যার মানে হলো সে আধ্যাত্মিক ভাবে অন্ধ। তাই সে *ইলমে বাতিন* বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে অস্বীকার করে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত: "একদা মহানবী (সা:) কতিপয় মানুষের কাছে এসে দাড়ালেন এবং মহান আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রশংসা করলেন, যেমন ভাবে তাঁর প্রশংসা করা উচিত। তারপর তিনি দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন: আমি পূর্বের সকল নবীর মত

তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। সন্দেহ নেই যে, নূহ (আ:) তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলব, যা আমার পূর্বে কোন নবী বলেন নাই। জেনে রাখ, সে হবে একচোখা কিন্তু আল্লাহ্ একচোখা নন।"

— সহীহ বুখারী

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত: "একদা মহানবী (সা:) কতিপয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রশংসা করলেন, যে প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। তারপর তিনি দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন: আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি যেমন পূর্বের সকল নবীই তাদের উম্মতকে তার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলব, যা কোন নবী আমার পূর্বে তার জাতিকে বলেন নাই: দাজ্জাল হবে একচোখা, কিন্তু আল্লাহ্ একচোখা নন।"

— সহীহ বুখারী

আব্দুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেছেন: "রাসূল (সা:)-এর উপস্থিতিতে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করা হলো। রাসূল (সা:) বললেন: আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে গোপন নন, তিনি একচোখা নন। তারপর তাঁর হাত দিয়ে চোখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তবে দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ এবং তা দেখতে উদ্‌গত আঙ্গুরের মত।"

— সহীহ বুখারী

উবাদা বিন সামিত (রা:) হতে বর্ণিত: "রাসূল (সা:) বলেছেন: আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এত কিছু বলেছি যে আমার ভয় হয় তোমরা হয়ত তা বুঝতে পারবে না। দাজ্জাল হলো বেটে, মুরগীর মত তার পায়ের পাতা, উষ্কখুষ্ক চুল, একচোখা, এক চোখে দেখে না, সেটা বেশী বেরিয়েও নেই, আবার বেশী ঢুকেও নেই। যদি বুঝতে না পার তবে জেনে নাও তোমাদের প্রভু একচোখা নন।"

— সুনান আবু দাউদ

ইবনে উমর (রা:) বলেন: "আমরা বিদায় হজ্জ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এবং সেখানে রাসূল (সা:) উপস্থিত ছিলেন। আমরা বিদায় হজ্জের কি মাহাত্ম্য তা জানতাম না। মহানবী (সা:) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন তারপর বিশদ ভাবে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের বিবরণ দিয়ে বললেন: আল্লাহ্-তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। নূহ (আ:) ও তাঁর পরবর্তী নবীরা তাঁদের জাতিকে তার সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। (হে মুহাম্মদের অনুসারীরা!) জেনে রাখ, সে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হবে। এমনও হতে পারে যে, তার কিছু কিছু গুণাবলী তোমাদের কাছে অজানা থাকবে। কিন্তু তোমাদের প্রভুর বিষয় তোমাদের কাছে পরিষ্কার, কোন কিছুই গোপন নেই। তারপর মহানবী (সা:) তিন বার বললেন: তোমাদের প্রভু এক চোখে অন্ধ নন, কিন্তু দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ, যা চোখের কোটর থেকে আঙ্গুরের থোকার মত বেরিয়ে থাকবে।"

— সহীহ বুখারী

আব্দুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেন: "রাসূল (সা:) লোকজনের সমক্ষে ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে বললেন: আল্লাহ্ একচোখা নন, কিন্তু দাজ্জাল ডান চোখে অন্ধ, যা দেখতে স্ফীত আঙ্গুরের ন্যায়। গত রাতে আমি কা'বার কাছে শুয়েছিলাম। আমি স্বপ্নে একজন বাদামি বর্ণের মানুষকে দেখলাম, বলতে হয় বাদামি বর্ণের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, তার মাথার চুল ছিল অনেক লম্বা যা দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলে পড়েছিল, তার চুল ছিল কালো, তার মাথা থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিল, সে দুই জনের কাঁধে ভর দিয়ে কা'বার প্রদক্ষিণ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: ইনি কে? লোকেরা বলল: ইনি ঈসা, মরিয়ম তনয়। তার পেছনে আমি একজনকে দেখলাম যার চুল ছিল কোঁকড়ানো আর ডান চোখ ছিল অন্ধ, দেখতে ইবনে কাতান (একজন আরব কাফের)-এর মত। সে একজনের কাঁধে ভর করে কা'বা প্রদক্ষিণ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এটা কে? তারা বলল: ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জাল।"

— সহীহ বুখারী

আনাস (রা:) বর্ণনা করেন: "রাসূল (সা:) বলেছেন: প্রত্যেক নবীই তার অনুসারীদেরকে মিথ্যাবাদী একচোখা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সাবধান সে একচোখে অন্ধ, কিন্তু তোমার প্রভু তা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফির'।" হাদীসটি আবু হুরায়রা এবং ইবনে আব্বাসও বর্ণনা করেছেন।

— সহীহ বুখারী

দাজ্জালের অন্ধ চোখটি দেখতে স্ফীত আঙ্গুরের মত

আব্দুল্লাহ (রা:) বর্ণনা করেন: "রাসূল (সা:) কিছু লোকের সামনে আল-মাসীহ আদ-দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করে বললেন: আল্লাহ্ একচোখ বিশিষ্ট নন, কিন্তু দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ যা দেখতে স্ফীত আঙ্গুরের ন্যায়।"

— সহীহ বুখারী

স্ফীত আঙ্গুরের সাথে তুলনা করার মানে হলো এই যে, যারা দুই চোখ দিয়ে দেখে তাদের পক্ষে দাজ্জাল এবং তার অনুসারীদের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব বুঝতে অসুবিধা হবে না। স্ফীত আঙ্গুরের মতই বিষয়টা তারা পরিষ্কার ভাবে দেখবে। কেবলমাত্র যারা আধ্যাত্মিক ভাবে অন্ধ তারাই এটা দেখতে পারবে না।

এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে দাজ্জালের চোখের বর্ণনাকে ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে নেওয়া উচিত, আক্ষরিক অর্থে নয়। নীচের প্রমাণগুলি সেটা আরো পরিষ্কার করে দিবে। প্রথমতঃ মুহাম্মদ (সা:) মদীনার একজন ইহুদি বালককে দাজ্জাল হিসেবে সন্দেহ করেছিলেন যদিও সে আক্ষরিক অর্থে একচোখা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ যখন তামীম আদ্-দারী দাজ্জালকে

সচক্ষে দেখলেন এবং পরে রাসূল (সা:)-কে তার বর্ণনা দিলেন, সেই বর্ণনায় তার এক চোখের কোন উল্লেখ ছিল না। যদি সে ডান চোখে অন্ধ হতো তাহলে এটাই হতো তার সবচেয়ে দর্শনীয় শারীরিক বর্ণনা।

কাফির শব্দটি দাজ্জালের দুই চোখের মাঝে লেখা থাকবে

আনাস (রা:) বর্ণনা করেন: "রাসূল (সা:) বলেছেন: প্রত্যেক নবীই তার অনুসারীদেরকে মিথ্যাবাদী একচোখা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সাবধান! সে একচোখে অন্ধ, কিন্তু তোমার প্রভু তা নন। তার দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফির'।" হাদীসটি আবু হুরায়রা এবং ইবনে আব্বাসও বর্ণনা করেছেন।

— সহীহ বুখারী

মানুষের উপর দাজ্জালের আক্রমণ প্রধানত জ্ঞানতাত্ত্বিক — জ্ঞানতাত্ত্বিক মানে যার সম্পর্ক জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতির সাথে, বা জ্ঞানের উৎসের সাথে। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'; এর অর্থ এই যে তার দেখার ক্ষমতা হবে সীমিত, জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা হবে সীমিত। দ্বিতীয়তঃ হাদীসটি থেকে এটাও পরিষ্কার যে দাজ্জাল এবং দাজ্জালের যুগের কুফ্‌র গোপন থাকবে না। শুধু সে-ই ওটা দেখতে পারবে না যে নিজেই অন্ধ। 'দুই চোখের মাঝখানে' কথাটির অর্থ, দৃষ্টিশক্তির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সংযোগ না হলে সত্যজ্ঞান অর্জন করা যায় না, যার পরিণতিতে মাঝখানে 'কুফর' অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

'কুফর' আধুনিক ইউরো-ইহুদি এবং ইউরো-খ্রীষ্টিয় পশ্চিমা সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য, যা সৃষ্টি হয়েছে জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে স্রষ্টাবিবর্জিত করার ফলে, যেখানে জ্ঞানের উৎস হিসেবে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির কোন স্থান নেই। ইহুদি-খ্রীষ্টিয় জগত কেবলমাত্র বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানকে, অর্থাৎ বস্তুজগতের জ্ঞানকে জ্ঞান মনে করে। তারা তাদের এই বৈশিষ্ট্যকে লুকাবারও চেষ্টা করে না, যেন প্রকাশ্যে জানিয়ে দিচ্ছে যে তাদের চোখের মাঝখানে 'কুফর' লেখা রয়েছে। আমরা বলি না যে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাই দাজ্জাল। তবে এটি নিশ্চয় দাজ্জালের সৃষ্টি এবং তারই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এথেকে যে আভাস আমরা পাচ্ছি তা হলো, যারা আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাকে অনুসরণ করবে তারা দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে, যার পরিণতিতে তারা স্রষ্টাবিমুখ হয়ে ঈমান হারিয়ে ফেলবে। আল্লাহ্‌-তা'আলা ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৯৯৯ জনই এভাবে ধ্বংস হবে এবং দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে।

মহান আল্লাহ্-তা'আলা এক চক্ষু বিশিষ্ট নন

এই প্রসঙ্গে একচোখা মানুষ তাকেই বলা যাবে যে কেবল এক চোখ দিয়ে দেখে, অর্থাৎ শুধু বাইরের দিকটা দেখে। যারা দাজ্জাল-প্রদত্ত জীবন ধারাকে অনুসরণ করবে তারা সবাই একচোখা হয়ে যাবে। হাদীসে যখন বলা হলো, আল্লাহ্ একচোখা নন, তার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ প্রকাশ্য এবং গোপন সবই দেখেন; অর্থাৎ যা নজরের সামনে রয়েছে আর যা নজরের সামনে নেই, সবই সমান ভাবে দেখেন; অর্থাৎ যা মনে হয় আর যা বাস্তবিক তার সবই দেখেন; অর্থাৎ বাহ্যিক আকৃতি আর তার অন্তঃসার সবই দেখেন। তাই তিনি কুর'আনে বলেছেন:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশমান, তিনিই অপ্রকাশমান, এবং তিনি সর্ববিষয়ে অধিক অবহিত।"

— সূরা হাদীদ, ৫৭:৩

যখন মূসা (আ:) উত্তর দিলেন যে তিনি সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানী, তখন তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সমস্ত জ্ঞানের আধার স্বয়ং আল্লাহ্, এবং তিনিই সব চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মূসা (আ:) এটাও খেয়াল রাখেননি যে তাঁর জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। জ্ঞানকে পার্থিব গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করলে এই পরিণতি হয়।

৮ § যুলকার্‌নাইনের কাহিনী

মদীনার ইহুদি র‍্যাবাইরা মুহাম্মদ (সা:)-এর সামনে উপস্থাপনের জন্য আরবের কুরাইশ গোত্রের হাতে তিনটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল এটা যাচাই করা যে তিনি সত্য নবী কি না। তিনটি প্রশ্নের একটি ছিল সেই পর্যটক সম্পর্কে যিনি পৃথিবীর দুই প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রশ্নের মাধ্যমে তারা এটা জানতে চেয়েছিল যে, মুহাম্মদ (সা:) শেষ সময়ের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে জানতেন কিনা।

যুলকার্‌নাইনের বিষয়টির সঙ্গে আধুনিক যুগের তাৎপর্য বর্ণনা করার আগে দেখে নেয়া যাক সেই বিখ্যাত পর্যটক সম্পর্কে র‍্যাবাইদের প্রশ্নের জবাব কুর'আনে কিভাবে দেয়া রয়েছে। সূরা কাহাফের ৮৩ নং আয়াতে শুরু হয়ে এটা শেষ হয় ১০১ নং আয়াতে:

আয়াত ৮৩

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

"তারা (*র‍্যাবাইরা*) আপনাকে যুলকার্‌নাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে অচিরেই সে বিষয়ের বর্ণনা দিব।"

আয়াত ৮৪

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

"আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম।"

আয়াত ৮৫

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

"অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন।"

আয়াত ৮৬

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ
قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

"চলতে চলতে যখন তিনি সূর্য ডোবার স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে (*অর্থাৎ, কৃষ্ণ সাগর — তাফসীর জালালাইন*) অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম: হে যুলকার্‌নাইন, (*আপনার অধিকার রয়েছে*) আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয় ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।"

আয়াত ৮৭

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

"তিনি বললেন: যে কেউ সীমালঙ্গন করবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে, আর তিনি তাকে (*আগে শোনা যায়নি এমন*) কঠোর শাস্তি দেবেন।"

আয়াত ৮৮

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

"তবে যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব।"

আয়াত ৮৯

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

"আবার তিনি এক পথ ধরলেন।"

আয়াত ৯০

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

"অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয় স্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি দেখলেন ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে, যাদের জন্যে (*সূর্যতাপ হতে আত্মরক্ষার*) কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।"

আয়াত ৯১

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

"প্রকৃত ঘটনা এটাই (*অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিলেন*)। তার (আসল) বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি (*অর্থাৎ, তিনি কেন এমন করলেন*)।"

আয়াত ৯২

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

"আবার তিনি এক পথ ধরলেন।"

আয়াত ৯৩

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

"অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না।"

আয়াত ৯৪

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

"তারা বলল: হে যুলকার্নাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ (*আমাদের*) দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনার জন্যে কিছু কর দিব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর গড়ে দিবেন।"

আয়াত ৯৫

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

"তিনি বললেন: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর গড়ে দিব।"

আয়াত ৯৬

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

"তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হলো তখন তিনি বললেন: তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই।"

আয়াত ৯৭

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

"অতঃপর তারা (*ইয়াজুজ ও মাজুজ*) তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না।"

আয়াত ৯৮

قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

"যুলকার্‌নাইন বললেন: এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।"

আয়াত ৯৯

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

"আমি সেদিন তাদেরকে ছেড়ে দেব দলে দলে তরঙ্গের আকারে (*অর্থাৎ, পৃথিবী অনাচারে ভরে উঠবে*) এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব (*অর্থাৎ, বিশ্বায়নের কারণে পৃথিবী একই সংস্কৃতির আওতায় চলে আসবে, এবং সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে*)।"

আয়াত ১০০

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

"সেদিন আমি কাফেরদের সামনে জাহান্নামকে বিছিয়ে ধরব (*অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত করব*)।"

আয়াত ১০১

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

"যাদের চোখের মধ্যে আমার জিকির থেকে আবরণ পড়ে গিয়েছিল, আর যারা শুনতেও অপারগ ছিল।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৮৩-১০১

যুলকার্‌নাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা

আরবিতে কার্‌নাইন কার্‌ন (অর্থাৎ শিং বা যুগ) শব্দের দ্বিবচন। অতএব, কার্‌নাইন মানে দু'টি শিং বা দু'টি যুগ। যেহেতু কুর'আনে সবখানে কার্‌ন শব্দটি যুগ বা ইতিহাসের পাতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনই শিং হিসেবে নয়, তাই আমরা যুলকার্‌নাইনের অর্থ করেছি: এমন এক ব্যক্তি যার প্রভাব রয়েছে ইতিহাসের দু'টি পাতার উপর। এবং যেহেতু ইহুদি র‍্যাবাইদের প্রশ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (সা:)-কে পরীক্ষা করে দেখা যে তিনি শেষ যুগের প্রধান সংকেত, অর্থাৎ, ইয়াজুজ এবং মাজুজ সম্পর্কে কি জানেন, সেহেতু আমরা মনে করি কার্‌নাইন শব্দটি সেই দু'টি যুগকে চিহ্নিত করে যখন ইয়াজুজ এবং মাজুজের ফেৎনা সর্বব্যাপী হবে: প্রথমটি সেই সুদূর অতীতের ঘটনা, আর দ্বিতীয়টি শেষ যুগের ঘটনা। উপরের আয়াতগুলিতে এই দুই ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। আমরা এও মনে করি যে, আমরা এখন সেই শেষ যুগে বাস করছি, অতএব মুসলিম জীবনের সাথে এই কাহিনীর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

যুলকার্‌নাইন কে ছিলেন? এই লেখকের মতে যুলকার্‌নাইন সত্যিকার অর্থে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন কি ছিলেন না সে প্রশ্নটি অতটা জরুরি না। তার চেয়ে বেশী জরুরি হলো তাঁর সেই আচরণ যা তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন। কারণ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে এই গল্পের ঐশ্বরিক পথনির্দেশনা।

সূরা কাহাফ এই গল্পের মাধ্যমে ক্ষমতার ব্যবহারের সাথে ঈমানের সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। যুলকার্‌নাইন আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁকে আল্লাহ্ এক বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যেন তিনি সেটা ব্যবহার করে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একটা বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার যোগ্যতা তাঁর ছিল — যাকে যুলকার্‌নাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই রূপক-কাহিনীর মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের সাথে গড়ে তোলা এক ইসলামি বিশ্ব-ব্যবস্থা, যা সুদূর অতীতে একবার বাস্তব রূপ নিয়েছিল। সেই বিশ্ব-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা এই গল্পের মধ্যে দেয়া রয়েছে।

এরপর গল্পটি শেষ যুগে ইয়াজুজ ও মাজুজের বিশ্ব-ব্যবস্থার আবির্ভাব সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে দেয়, যখন ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হবে যুলকার্‌নাইনের তুলনায় ঠিক উল্টো ভাবে, অর্থাৎ অন্যায়, উৎপীড়ন ও শোষণের উদ্দেশ্যে। পরিশেষে, এই আশ্বাস বাণী দেয়া হয় (যেমন গুহার যুবকদের কাহিনীতেও দেয়া হয়েছিল) যে, ইতিহাসের চাকা সম্পূর্ণরূপে ঘুরে না আসা পর্যন্ত ইতিহাসের ঘটনাবলী শেষ হবে না, অর্থাৎ এমন একটা বিশ্ব-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে যেখানে ক্ষমতাকে সেই ভাবে ব্যবহার করা হবে যেভাবে যুলকার্‌নাইন করেছিলেন। এই ঘটনা বাস্তব আকার ধারণ করবে যখন সত্যমাসীহ মরিয়ম-

তনয় ঈসা (আ:) পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, এবং সত্যের ভিত্তিতে ইসলামি বিশ্ব-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।

যুলকার্‌নাইনের পশ্চিম প্রান্তে যাত্রা

যুলকার্‌নাইন পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে এমন এক জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে তিনি একটি সাগরের কালো ঘোলাটে পানিতে সূর্যকে (*কাব্যিক অর্থে*) ডুবে যেতে দেখলেন। এর মমার্থ হলো এই যে, তিনি পশ্চিম দিকে ততদূর গিয়েছিলেন যতদূর তখন যাওয়া যেত।

সেই কালো সাগরের কাছে যুলকার্‌নাইন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হলেন। আল্লাহ্-তা'আলা তাঁকে ক্ষমতা দিলেন, এবং শাস্তি ও পুরস্কার দেবার অধিকারও দিলেন। উত্তরে যুলকার্‌নাইন যা বললেন সেটাই হলো ইসলামি বিশ্ব-ব্যবস্থার সারবস্তু। তিনি বললেন যে তিনি তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করে অত্যাচারীদের শাস্তি দিবেন, এবং যখন তাঁর শাস্তি দেয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবার পর তারা অতিরিক্ত শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মানবজাতি এধরনের বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তুলুক এবং চালু রাখুক, এটাই আল্লাহ্-তা'আলা চান। বিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত এরূপ বিশ্ব-ব্যবস্থায় স্বর্গীয় ও পার্থিব অনুশাসনের মধ্যে একটা ঐকতান দেখা যাবে। মূল কথা হলো, যখনই নিপীড়নকে দমন করে ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখনই একটা কল্যাণকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে সুখ ও শান্তি বিরাজ করতে পারে।

যুলকার্‌নাইনের পূর্ব প্রান্তে যাত্রা

পশ্চিম দিকের ভ্রমণের বর্ণনা দেয়ার পর, সূরা কাহাফ যুলকার্‌নাইনের পূর্ব দিকের (যেখানে সূর্য উদয় হয়) ভ্রমণের বর্ণনা দেয়। সেখানে তিনি এক সম্প্রদায় পেলেন যাদের সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঘোষণা করলেন যে: "আবরণ হিসেবে আমি তাদের জন্য এটা (মাথার উপর সূর্য) বাদে অন্য কিছু সরবরাহ করিনি।" এই অবস্থা দেখে যুলকার্‌নাইনের প্রতিক্রিয়া কি ছিল, তার বর্ণনা এই গল্পে এমন ভাষায় করা হয়েছে, যার ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন। বলা হয়েছে, *কাযালিক*। যার মানে হতে পারে, *তিনি তাদেরকে যে অবস্থায় পেলেন, সেই অবস্থায় (অবিম্নিতভাবে) ছেড়ে এলেন*। অবশ্যই যুলকার্‌নাইন তাদের অবস্থা পুরাপুরি ভাবে বুঝেছিলেন।

বলা হয়েছে, সেই সম্প্রদায়কে কোন আবরণ দেয়া হয়নি, তাহলে তারা কি দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে রাখত? এবং এব্যাপারে আমরা যুলকার্‌নাইনের রহস্যময় প্রতিক্রিয়াকে কিভাবে বুঝব?

"আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন", এই স্বীকৃতির সাথে আমরা আমাদের ব্যাখ্যা দেবার সাহস করতে পারি। মনে হয় এখানে সূরা কাহাফ বিশ্বাসীদেরকে ফেৎনার যুগের অবিচারের বিষয়ে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করছে, যখন পৃথিবীর সকল সম্পদের উপর এবং বিশেষ করে তেলের উপর আধুনিক বিশ্বের কুনজর পড়বে, এবং তারা মানব অধিকারের পরোয়া না করে সাধারণ মানুষের উপর প্রচন্ডভাবে নিপীড়ন চালাবে। ফলে যে সকল আদিবাসীদের একমাত্র সম্পদ তাদের জমি আর কুঁড়েঘর, তাদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হবে শুধু এই কারণে যে তাদের জমির নীচে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।

যুলকার্নাইন সম্পদের তুলনায় মানুষকে আর তার মৌলিক অধিকারকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। তাই তিনি সেই আদিবাসীদের জমি আর বাড়ী কেড়ে নেন নি। যখন শেষ যুগ আসবে, এবং রিবা মানুষকে হতদরিদ্রে পরিণত করবে, তখন প্রাকৃতিক সম্পদ তুলতে গিয়ে ঈমানদারদের উচিত হবে মানুষের মানবতাকে সম্মান করা।

যুলকার্নাইনের রহস্যপূর্ণ তৃতীয় যাত্রা

পশ্চিম এবং পূর্বদিকে যাত্রা দু'টির বর্ণনা দেবার পর, অর্থাৎ ইহুদি র‍্যাবাইদের প্রশ্নের আপাত উত্তর দেবার পর, কুর'আন একটি তৃতীয় যাত্রার কথা উল্লেখ করেছে যা ইহুদিদের প্রশ্নের আসল লক্ষ্য ছিল, যদিও তারা সেটা খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞেস করে নাই।

এই তৃতীয় যাত্রার বর্ণনা দেবার সময় সূরা কাহাফ প্রথমবারের মত ইয়াজুজ এবং মাজুজের নাম উল্লেখ করেছে। পৃথিবীতে তাদের মুক্তি কিয়ামতের একটি প্রধান সংকেত হিসেবে বলা হয়েছে। এটা বুঝতে হবে যে, কিয়ামতের আলামতের জ্ঞান মানব বুদ্ধির নাগালের বাইরে। নিঃসন্দেহে এরূপ জ্ঞান আল্লাহ্র নবীদের বিশেষ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

এই সূরাটি আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে যুলকার্নাইন তাঁর তৃতীয় যাত্রায় এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছলেন যারা দু'টি পর্বতমালার মাঝে এক গিরিপথে বাস করত। তারা অভিযোগ করল যে তাদের এলাকায় ইয়াজুজ এবং মাজুজ *ফাসাদ* সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা তাঁকে একটি দেয়াল নির্মাণ করে দিতে অনুরোধ করল যেন ইয়াজুজ এবং মাজুজকে আটকানো যেতে পারে। এই কাজের জন্য তারা যুলকার্নাইনকে খরচ দিতে প্রস্তুত ছিল।

ইয়াজুজ এবং মাজুজ মানব জাতির দু'টি সম্প্রদায়। নবী (সা:) বলেছেন, তারা নূহ (আ:)-এর বংশধর। উপরে বলা হয়েছে, তারা *ফাসাদ* সৃষ্টিকারী। এছাড়াও নবী (সা:) হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্র সাথে তাঁর আলাপের কিছু অংশে বলেছেন যে, *আমি এমন এক জাতিকে (ইয়াজুজ এবং মাজুজ) সৃষ্টি করেছি যারা এত শক্তিশালী যে আমি ছাড়া কেউ তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না*। অতএব বলতে হয়, তাদের দুর্জেয় শক্তির সাহায্যে তারা পৃথিবীর শান্তি ধ্বংস করতে পারে। সেই অর্থে আচরণের দিক দিয়ে তারা যুলকার্নাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

যুলকার্‌নাইন একটি লোহার দেয়াল তৈরী করলেন এবং এটার উপর গলিত তামার প্রলেপ দিয়ে দিলেন। দেয়ালটি গিরিপথকে বন্ধ করে দিল। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজ সেটাতে ছেদ করতে পারল না বা সেটাকে ডিঙিয়ে যেতে পারল না। যুলকার্‌নাইন বললেন দেয়ালটির নির্মাণ, এবং ইয়াজুজ-মাজুজকে আটকাতে পারা আল্লাহ্‌র করুণার ফলস্বরূপ। কিন্তু তিনি আরো প্রকাশ করলেন যে আল্লাহ্‌ স্বয়ং একদিন দেয়ালটিকে ধ্বংস করবেন এবং শেষ সময়ে ইয়াজুজ এবং মাজুজকে পৃথিবীতে মুক্ত করে দিবেন।

যখন ইয়াজুজ এবং মাজুজ পৃথিবীতে আর্বিভূত হবে তখন পৃথিবী কি প্রত্যক্ষ করবে তার বর্ণনা দিয়ে সূরাটি শেষ হয়েছে:

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

"আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত করব; যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার স্মরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৯৯-১০১

শেষ যুগে যখন ইয়াজুজ এবং মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে, তখন মানবজাতি এমন একটি বিশ্ব-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করবে যা হবে ইসলাম যা দিতে পারত তার বিপরীত। মানুষ দেখবে ক্ষমতা এমন লোকদের হাতে রয়েছে যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না। তারা ক্ষমতা ব্যবহার করে নিপীড়িতকে মুক্তিদান আর নিপীড়ককে শাস্তিদান না করে ন্যায়পরায়ণ বিশ্বাসীদের উপর (বিশেষ ভাবে) অত্যাচার চালাবে।

পবিত্র কুর'আনে জেরুযালেম গ্রন্থে আমরা যুক্তি দেখিয়েছি যে মহান আল্লাহ্‌ ইয়াজুজ এবং মাজুজকে নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবদ্দশায় মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

কুর'আন বিশ্বাসীদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সরবরাহ করেছে যার দ্বারা তারা যে শুধুমাত্র ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তির প্রমাণ পাবে তাই নয়, তারা এটাও বুঝতে পারবে যে পৃথিবী এখন ইয়াজুজ এবং মাজুজের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অর্থাৎ বুঝতে পারবে যে ইয়াজুজ ও মাজুজই এখন পৃথিবীর নিয়ন্তা শক্তি। এই যুক্তির পক্ষে বর্ণনা রয়েছে সূরা আম্বিয়ায়, যেখানে ইয়াজুজ এবং মাজুজের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾

"যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ সেখানে ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে, এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।"

— সূরা আম্বিয়া, ২১:৯৫-৯৬

যখন ইয়াজুজ এবং মাজুজ মুক্ত হবে এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন সেই শহরে তার অধিবাসীবৃন্দকে ফিরিয়ে আনা হবে। হাদীসে এধরনের মাত্র একটি শহরের নাম এসেছে যেটা আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, এবং যার বর্ণনায় ইয়াজুজ-মাজুজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শহরটি হলো জেরুযালেম।

ইয়াজুজ এবং মাজুজ সংক্রান্ত হাদীসগুলিতে জেরুযালেম ছাড়া (আল্লাহ্ কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত) অন্য কোন শহর বা নগরের উল্লেখ নেই, তাই আমরা নিশ্চিত যে সূরা আম্বিয়ায় (আয়াত নং ৯৫ এবং ৯৬) বর্ণিত শহর বা নগরটি শুধুমাত্র জেরুযালেমই হতে পারে।

শহর বা নগরের এই চিহ্নিতকরণের সাথে মিলে যাচ্ছে পবিত্রভূমিতে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন, যা ইয়াজুজ এবং মাজুজের মধ্যস্থতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। অন্য কথায়, যে ইউরো-বিশ্বব্যবস্থা ওয়াশিংটন থেকে দুনিয়ার উপর শাসন চালাচ্ছে, সেটা ইয়াজুজ-মাজুজেরই বিশ্বব্যবস্থা।

কুর'আন সর্তক করে দিয়েছে যে যখন এই ঘটনাগুলি ঘটবে, তখন আমরা দেখব যে শেষ সময়ের ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে।

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

"সত্য প্রতিশ্রুতির সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে; (তারা বলবে) হায় আমাদের দূর্ভাগ্য আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম। বরং আমরা তো যালিম ছিলাম।

— সূরা আম্বিয়া, ২১:৯৭

মুক্তি পেয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এর মানে এই যে তাদের অজেয় ক্ষমতা দিয়ে তারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নিবে, এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মত এক বিশেষ গোষ্ঠি এককভাবে সমগ্র মানবজাতিকে শাসন করবে। আমরা এখন সেই সময়ের ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করছি।

ফাসাদ (অত্যাচার ও পাজিপনা) হবে ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূরা কাহাফ ফাসাদের যে দু'টি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছে, সেগুলি যুলকার্‌নাইনের বিশ্বব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য দু'টির একেবারে বিপরীত।

৯ § সূরা কাহাফ: শুরুর অংশ

ভণ্ড-মাসীহ তথা খ্রিষ্ট-শত্রু (Anti-Christ) দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য মহানবী (সা:) বিশ্বাসীদেরকে সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত পড়ার উপদেশ দিয়েছেন।

আবু দারদা (রা:) হতে বর্ণিত: "আল্লাহ্‌র নবী (সা:) বলেছেন: যদি কেউ সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে, তবে সে দাজ্জাল থেকে রক্ষা পাবে।"

— সহীহ মুসলিম

"তোমাদের মাঝে যে তাকে (দাজ্জালকে) দেখা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, তার উচিৎ হবে সূরা কাহাফের গোড়ার দিকের আয়াতগুলি পড়া।"

— সহীহ মুসলিম

দাজ্জাল বিশ্বাসীদের জন্য কিধরনের বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, সেটাকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে আমরা এখন সূরা কাহাফের প্রথম দিকের সেই দশটি আয়াতের আলোচনা করব। যদি *বিসমিল্লাহ*-কে প্রথম আয়াত হিসাবে গণ্য করা না হয়, তাহলে আমরা লক্ষ্য করি যে সূরা কাহাফের এই অংশটি একটি দোয়া বা প্রার্থনা দিয়ে শেষ হয়। যে গল্পটির মধ্যে দোয়াটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেটি এখানে দেয়া হলো।

কতিপয় যুবক, বয়সে অল্প হওয়া সত্যেও, আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করত। তারা এমন এক যুগে বাস করত যখন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল, এবং বিশ্বাসীদেরকে ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। এই যুবকেরা অনেক সংবরণ করেও যখন আর পারলো না, তখন ইসলামের প্রতি বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে শহর থেকে পালাতে বাধ্য হলো। তারা একটি গুহায় (অর্থাৎ পাহাড়ে) আশ্রয় নিল এবং আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা ও হেদায়েতের জন্য দোয়া করল। সেই দোয়ার সাথেই সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত শেষ হয়:

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

"যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা বলেছিল: হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি নিজের থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:১০

অতএব এই দোয়াটিকে দাজ্জালের পরীক্ষা ও বিপদ হতে রক্ষা পাবার চাবিকাঠি মনে করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি একজন মুসলমান বিমানে ভ্রমণকালে কোন

বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখানকার ইমিগ্রেশন কর্মচারীর সম্মুখীন হয়, এবং যদি দেখে যে সেই কর্মচারী ইসলামের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে তাকে নাজেহাল করার চেষ্টা করছে, তাহলে তার এই দোয়াটি পড়া উচিত। আর যদি হাতে যথেষ্ট সময় থাকে তাহলে সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াতের সবটাই পড়ে।

এখানে সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত তুলে ধরা হলো। আমাদের মন্তব্যসহ আমরা চেষ্টা করেছি ভণ্ড-মাসীহ দাজ্জালের সাথে এর সম্পর্ককে ব্যক্ত করতে। (পাঠক যদি *বিসমিল্লাহ*কে সূরাটির প্রথম আয়াত মনে করেন, তাহলে নিম্মোক্ত আয়াতটি অবশ্যই দ্বিতীয় আয়াত হবে)।

প্রথম আয়াত

الْحَمْدُ لِلَّـــهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ ﴿١﴾

"সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিজের বান্দা নবী (সা:)-এর প্রতি এই গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তিনি এতে কোন অসংগতি রাখেন নি।"

আয়াতটি শুরু হয়েছে একটু নাটকীয় ভাবে। মহান আল্লাহ্ নিজের প্রশংসা করছেন তার বান্দা মুহাম্মদ (সা:)-এর উপর কুর'আন নাজিল করার কারণে। কিন্তু আরববাসী মুহাম্মদ (সা:) ইহুদি ছিলেন না, ফলে, এই ঐশ্বরিক কাজটি ইহুদিদেরকে একটি হতাশাজনক সংকটে ফেলে দিল। অপর দিকে, কুর'আন ইহুদিদেরকে অভিযুক্ত করেছে তৌরাতের মধ্যে রদবদল করার জন্যে:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

"অনন্তর যারা অত্যাচার করেছিল — তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তারা সে কথার পরিবর্তন করলো, পরে অত্যাচারীরা যে দুষ্কার্য করেছিল, তজ্জন্যে আমি তাদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম।"

— সূরা বাকারাহ, ২:৫৯

তৌরাতের মূল বইয়ের মধ্যে বিকৃতির কারণে পরবর্তী কালের ইহুদিদের পক্ষে একজন অইহুদিকে নবী হিসেবে মেনে নেয়া অসম্ভব ছিল। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস ঢোকানো হয়েছিল যে তারা হলো "আল্লাহ্‌র বাছাইকৃত জাতি"। তারা মনে করত, মানবজাতির আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল। সেকারণে ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে দুনিয়াকে তারাই শাসন করবে, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। তারা মনে করত, অইহুদিদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা তাদের তুলনায় নিম্নমানের ছিল, অতএব এটা কেমনে সম্ভব যে একজন অইহুদি আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে মনোনীত হবে। বিশেষ করে আরবরা হলো ইসমাঈল (আ:)-

এর বংশধর, আর তৌরাতে তাঁর সম্পর্কে যা লেখা রয়েছে তারপরে তো একজন আরব নবী হবে সেটা চিন্তাই করা যায় না। সেখানে লেখা রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ছিল ইসহাক (আ:)-এর সাথে, ইসমাঈল (আ:)-এর সাথে নয়। আরও কটুক্তি করে লেখা রয়েছে, *মানুষ হলেও সে বুনো গাধার মত হবে; সে সকলকে শত্রু করে তুলবে আর অন্যেরাও তাকে শত্রু বলে মনে করবে*। (তৌরাত, পয়দায়েশ, ১৬:১২)।

তথাপি ইয়াসরিবের (এখনকার মদীনা) ইহুদি র‍্যাবাইদের কাছে এটা হতাশাজনক ভাবে পরিষ্কার ছিল যে, মুহাম্মদ (সা:) অবশ্যই আল্লাহ্‌র একজন সত্যিকার নবী ছিলেন। ইহুদিরা ক্ষুদ্ধ ছিল যে, সুমহান আল্লাহ্ শেষ ওহীর গ্রহীতা হিসেবে একজন আরবকে পছন্দ করেছিলেন। এটা মেনে নিলে তারা মানতে বাধ্য হতো যে তারা তৌরাতে বিকৃতি ঘটিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আরবদের উপর জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর পক্ষে তাদের আর কোন কেতাবী সমর্থন থাকত না।

কুর'আন ইহুদিদের এই হতাশাকে লক্ষ্য করেছিল। তাই কুর'আন বলছে:

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ بَغْيًا
أَن يُنَزِّلَ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ
فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

"যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই নিকৃষ্ট, যেহেতু তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা এই হঠকারিতার দরুন অস্বীকার করেছে যে, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

— সূরা বাকারাহ, ২:৯০

তাই গোড়া থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে এই সূরাটি বিশেষ ভাবে মুহাম্মদ (সা:)-এর, তথা কুর'আনের প্রত্যাখ্যানকারী ইহুদিদেরকে সম্বোধন করছে। সেই সাথে আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, দাজ্জালকে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য হলো ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করা।

এই আয়াতটি আমাদেরকে এটাও জানিয়ে দিচ্ছে যে কুর'আন আসার আগে তৌরাতসহ অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করা হয়েছিল। তাই দাজ্জালকে এবং তার আক্রমণের লক্ষ্যকে বোঝার জন্য যে আভাস-ইঙ্গিতের দরকার তা পাওয়া যাবে তৌরাতসহ এই সকল ধর্মগ্রন্থের বিকৃতির ভেতরে। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু কুর'আনের মধ্যে কোন অসংলগ্নতা নেই, এবং চিরকাল এরকমই থাকবে, তাই একমাত্র কুর'আনই তৌরাতসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সব ধরনের বিকৃতিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম। সেকারণে সব ধরনের বিকৃতিকে খুঁজে বের করার জন্য কুর'আনকে গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা উচিত। অতএব, শুধু কুর'আন নয়, বাকি ধর্মগ্রন্থগুলিকেও গভীরভাবে অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

যদি আমরা তৌরাতের অধ্যয়ন না করি, এবং মানুষের হাত এতে কিধরনের পরিবর্তন এনেছে তা আবিষ্কার না করি, তাহলে কখনই বুঝতে পারব না এযুগে রিবা, মদ ও মাদকদ্রব্যের ছড়াছড়ি কেন বেড়ে চলেছে। আমরা বুঝতে পারব না মাদকাসক্তির সাথে "ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের" কি সম্পর্ক। একই ভাবে আমরা রিবা-ভিত্তিক অর্থনীতির উৎস এবং তারই পরিণতিতে কাগুজে মুদ্রার প্রবর্তনের কারণ বুঝতে পারব না। বলা বাহুল্য, এসবই আজকের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল উপকরণ, এবং শীঘ্রই কাগুজে মুদ্রা বিলীন হয়ে ইলেক্ট্রনিক মুদ্রায় পরিণত হবে, যা হাতে ছোঁয়া যাবে না। আজ এই ব্যবস্থাই বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে।

"মহানবী (সা:) বলেছেন: ইসলামের সবকটি গিরা এক এক করে খুলে যাবে; প্রথমটি হবে আল্লাহ্‌র কিতাবে দেয়া নিয়মাবলী, আর শেষটি হবে নামায।"

— মুসনাদে আহমদ

মহানবী (সা:) ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যে কিয়ামত বা শেষ দিনের আগমনের একটি আলামত হলো আল্লাহ্‌র কিতাবে দেয়া মদের নিষিদ্ধকরণকে উপেক্ষা করা হবে, অর্থাৎ মদ ও মাদকদ্রব্যের ছড়াছড়ি হবে:

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত: তিনি আল্লাহ্‌র নবী (সা:)-কে বলতে শুনেছেন: কিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে — জ্ঞান উঠে যাবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে, অবৈধ যৌনাচার বিস্তার পাবে, মদ্যপানে কোন বাধা থাকবে না, পুরুষের সংখ্যা কম আর মেয়েদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষ পঞ্চাশ জন মেয়ের দেখাশুনা করবে।"

— বুখারী, মুসলিম

যারা ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক, অর্থাৎ তাসাউফ বা ইহসান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে আমরা এখন সেই যুগে বাস করছি, যাকে মহানবী (সা:) কিয়ামতের যুগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আমেরিকার প্রতি ছ'টি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার সুরাসক্ততার শিকার, এবং এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাকি পৃথিবী কাল তাই করবে যা আমেরিকা আজ করছে; আর এটাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি সংকেত। তবে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র নিদর্শন নিয়ে মাথা ঘামায় না:

. . . وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

" . . . কিন্তু সত্যই অনেক লোক আমার নির্দশনসমূহ হতে উদাসীন রয়েছে।"

— সূরা ইউনুস, ১০:৯২

আল্লাহ্‌র পাঠানো কিতাবের নির্দেশগুলি হাত দিয়ে বদলে দেয়ার কারণে সুরার প্রতি আসক্তি এত সহজ হয়ে গিয়েছে। মদ খাওয়া ও সুদের সাথে সম্পৃক্ততাকে নাজায়েয বলা হয়েছিল; কিন্তু তারা কিতাব থেকে এগুলি মুছে ফেলে। যারা তৌরাতকে নিজের

খেয়ালখুশি মত লিখেছিল, তারাই আবার মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে একজন সত্য নবীকে মাতাল বলে অভিযুক্ত করেছিল। সেই মাতাল অবস্থায় তিনি নাকি তার দুই কন্যাকে একের পর এক গর্ভবতী করে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল একটা জঘন্য অপবাদ। এটা ছিল আল্লাহ্‌র নবী লূত (আ:)-এর প্রতি এক অমার্জনীয় অপমান, এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এক অশালীন আক্রমণ।

আল্লাহ্ তাদের সেই পাজিপনার উত্তর দিয়ে লূত (আ:)-কে সকল নোংরা অপবাদ থেকে মুক্ত করলেন:

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ
وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾

"আমি লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। আমি তাকে আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।"

— সূরা আম্বিয়া, ২১:৭৪-৭৫

আল্লাহ্‌র কথাকে বিকৃত করার মাধ্যমে তারা আসলে এক পাপের বীজ বপন করল। আল্লাহ্ সেই কুকর্মের উত্তর দিলেন দাজ্জালকে সৃষ্টি করে এবং তাকে পৃথিবীতে মুক্ত করে। ইতোমধ্যে, দাজ্জাল তার মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে সেই বীজকে এমন এক অশুভ গাছে পরিণত করেছে, যা কেউ কেটে ফেলতে পারবে না। অসাধারণ চাতুর্য ও দক্ষতার সাথে দাজ্জাল মানবজাতিকে মদ এবং অন্যান্য মাদকের উপর নির্ভরশীল করে ফেলেছে। আমার বিশ্বাস, মালকম এক্স (Malcolm X) বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বলতেন: ধর্মহীন পাশ্চাত্য জীবনে সুরা এবং মাদকদ্রব্যের আসক্তি হলো *সেই পাপের ফল যার বীজ তারা বহু আগে বপন করেছিল।*

আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে, যে কথা মদের বেলায় সত্য, সেটা রিবার বেলায়ও সত্য। আল্লাহ্ রিবাকে (সুদে টাকা লেনদেন করা) নিষিদ্ধ করেছিলেন। তারা তৌরাতের কথাকে বদলে দিয়ে লিখল: ঈমানদার, অর্থাৎ ইসরাঈলীদের কাছ থেকে সুদ নেয়া হারাম, তবে অইহুদিদের কাছ থেকে সুদ নেয়া জায়েয:

"তোমরা কোন ইসরাঈলীয় ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ নেবে না; সেই সুদ টাকা-পয়সার উপরেই হোক কিংবা খাবার জিনিসের উপরেই হোক কিংবা অন্য যে কোন জিনিসের উপরেই হোক। অন্য জাতির লোকদের কাছ থেকে তোমরা সুদ নিতে পার কিন্তু কোন ইসরাঈলীয় ভাইয়ের কাছ থেকে নয়। এইভাবে চললে তোমরা যে দেশ দখল করতে যাচ্ছ সেখানে তোমরা যাতে হাত দেবে তাতেই তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের আর্শীবাদ করবেন।"

— তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩:১৯-২০

আল্লাহ্‌র বাণীকে পরিবর্তন করা ছিল কিতাবকে কাটাছেঁড়া করার অপরাধ, তথা শির্‌ক। এই *এওয়াজ* (عِوَج) বা বক্রতার উদাহরণ দিয়েই সূরা কাহাফের বক্তব্য শুরু হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা:) এই অপরাধের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেই বলেছেন যে, একটা সময় আসবে যখন সুদ সমগ্র মানবজাতিকে এক মৃত্যু আলিঙ্গনে জাঁকড়ে ধরবে:

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন: "আল্লাহ্‌র নবী (সা:) বলেছেন, মানবজাতির উপর একটি সময় আসবে যখন সুদ ভোগ করে না এমন একজনও থাকবেনা; যদি সুদ নাও নিয়ে থাকে, তত্রাপি সুদের বাষ্প অথবা ধূলা তার কাছে পৌঁছবে।"

— আহমদ, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাযাহ

আমরা এখানে এই বলে শেষ করব যে সূরা কাহাফ প্রথম আয়াতেই বিশ্বাসীদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী দিয়েছে। সেই আলোকে আমরা দেখছি যে, মানবজাতির উপর দাজ্জালের আক্রমণের মূল রহস্য নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে, বিশেষ করে তৌরাতের মধ্যে, রয়েছে। এই কিতাবে যে শিক্ষা ছিল তাকে বদলানো হয়েছিল ও বিকৃত করা হয়েছিল। বিশ্বাসীদের উচিত এই পরিবর্তনগুলিকে অধ্যয়ন করা, যেন তারা দাজ্জালের আক্রমণকে চিনতে পারে এবং যথাযথ ভাবে তার মোকাবিলা করতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াত

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

"একে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে (*যা এখন তাদের উপর নেমে আসছে*) সতর্ক করবার জন্যে (*তাদেরকে, যারা কুর'আনের অবিকৃত এবং চিরন্তন হেদায়তকে মানতে রাজি না*), আর বিশ্বাসীগণ, যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্যে যে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম পুরস্কার।"

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন যে কুর'আনকে তিনি সকল বিকৃতকরণ এবং অসঙ্গতি থেকে রক্ষা করবেন। এই ঘোষণার মধ্যে মানবজাতির জন্য রয়েছে এক বিশাল চিন্তার বিষয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, চক্রান্তকারীরা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে বিকৃত করেছিল, কিন্তু কুর'আনের বেলায় কেউ সেটা করতে পারবে না।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"আমিই কুর'আনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।"

— সূরা হিজর, ১৫:৯

অন্য ভাষায়, কুর'আন বিশ্বাসীদের পক্ষে আর অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে। কাকে, কিভাবে এবং কেন শাস্তি দেয়া হবে সেটাও কুর'আনই বলে দিবে। তবে, যারা কুর'আনকে বিশ্বাস করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের জন্যে আয়াতটিতে

রয়েছে আশার বাণী। সুতরাং কুর'আনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং (রাসূল (সা:)-এর সুন্নতের অনুকরণে) ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপনই দাজ্জালের ফেৎনার প্রতি সমুচিত জবাব।

এই আয়াতটির আরেকটি মর্মার্থ হলো, শুধুমাত্র কুর'আনের নির্দেশনার প্রতি বিশ্বাসীগণই দাজ্জালের আক্রমণের পর বেঁচে থাকবে। সুতরাং বিশ্বাসীদের নেতৃত্ব থাকতে হবে এমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের হাতে যারা কুর'আনের জ্ঞানে সবার অগ্রনী। উপরন্তু, আধুনিক যুগে কুর'আনের অনুশাসনগুলি কিভাবে পালন করা যায় সেই প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষভাবে পারদর্শী হতে হবে।

৩য় আয়াত

مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾

"তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে।"

যারা বিশ্বাস এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণের ফলস্বরূপ দাজ্জালের মহাপরীক্ষাকে অতিক্রম করবে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জান্নাত, যেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। তবে, বিশ্বাস ও ন্যায়পরায়ণ জীবন অত্যন্ত কঠিন হতে থাকবে, কারণ দাজ্জাল ধর্মের উপর, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের উপর যুদ্ধ উত্তরোত্তর বাড়াতেই থাকবে। মানুষ নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে পারবে না। এই অবস্থার বর্ণনা নিম্নের হাদীসগুলিতে রয়েছে:

আবু সা'লাবা কুশানি হতে বর্ণিত: আবু উমাইয়া শা'বানি বলেন আমি আবু সা'লাবা কুশানিকে জিজ্ঞেস করলাম: *নিজেদের জন্য চিন্তা কর*, এই আয়াতটি সম্পর্কে তোমার মতামত কি? সে বলল: আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি এটা সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশি অবগত তাঁকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি আল্লাহ্‌র নবী (সা:)-কে এটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন: "না, যা ভাল তা করতে একে অপরকে উৎসাহ দাও, আর যা মন্দ তা করা থেকে একে অপরকে নিষেধ কর। হ্যাঁ, যখন দেখবে দান-দক্ষিণা কমে গেছে, আবেগ প্রাধান্য পাচ্ছে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজের মতামতে বিমোহিত হয়ে রয়েছে, তখন লোকেরা যা করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিও না, কারণ তোমার সামনের দিনগুলিতে অনেক সহ্য ক্ষমতার প্রয়োজন হবে যা জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিয়ে সহ্য করার মত হবে। সেই সময়ে যে ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থাকবে, সে তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের সমান পুরস্কার পাবে।" আরেকটি সংস্করণে আছে, শ্রোতারা জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ্‌র নবী, আমাদের মত পঞ্চাশ জনের পুরস্কারের সমান? তিনি উত্তর দিলেন: "তোমাদের মত পঞ্চাশ জনের সমান পুরস্কার।"

— তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ

আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত: "আল্লাহ্‌র নবী (সা:) বলেছেন: একটা সময় আসছে যখন ধর্মকে ধরে রাখা জ্বলন্ত কয়লা হাতে ধরে রাখার মত হবে।"

— তিরমিযী

মহানবী (সা:) বলেছেন, দাজ্জালের আক্রমণই হলো আদম (আ:) থেকে শুরু করে শেষ সময় পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় ফেৎনা:

আবু কাতাদাহ হতে বর্ণিত: আমরা হিশাম বিন আমিরের সামনে দিয়ে ইমরান বিন হুসাইনের কাছে যেতাম। একদিন সে বলল: "তোমরা আমার সামনে দিয়ে আরেক জনের কাছে যাও, কিন্তু (যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে) আমার চেয়ে বেশি কেউ আল্লাহ্‌র নবী (সা:)-র সাথে থাকেনি এবং কেউ আমার চেয়ে বেশি হাদীস জানে না। আমি আল্লাহ্‌র নবী (সা:)-কে বলতে শুনেছি: আদম (আ:) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় ফেৎনা আর সৃষ্টি হয় নি।"

— সহীহ মুসলিম

তাই এটাই ন্যায়সঙ্গত যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার তাদেরকেই দেয়া হবে যারা সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে ধৈর্যসহকারে ঈমানকে ধরে রাখবে।

৪র্থ এবং ৫ম আয়াত

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّـهُ وَلَدًا ﴿٤﴾

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

"এবং তাদেরকে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে যে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে (*অর্থাৎ, আল্লাহ্ যে সন্তানের পিতা হয়েছেন*) তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। কত উদ্ভট তাদের মুখের কথা, তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা।"

কুর'আনের বিখ্যাত আধুনিক ভাষ্যকার মুহাম্মদ আসাদ (আল্লাহ্ তার আত্মার উপর শান্তি বর্ষণ করুন) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

"অধিকাংশ উচ্চমানের তফসীরের মধ্যে, এবং আমি যতটুকু জানি, কুর'আনের প্রথম যুগের অনুবাদগুলিতে *বেহী* (بِهِ) শব্দের মধ্যে যে সর্বনামটি রয়েছে, তার অর্থ করা হয়েছে, 'আল্লাহ্ নিজের জন্য একটি ছেলে নিলেন', তাই বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, 'তাদের এ সম্পর্কে কোন কিছু জানা নেই এবং তারা এরকম কোন ঘটনা সম্পর্কে জানে না'। তবে ব্যাখ্যাটি দুর্বল, কারণ অজানা থাকলেই যে ঘটনাটি ভুল হয়ে যাবে তা বলা যায় না। অতএব, *বেহী* কথাটির অর্থ 'এ সম্পর্কে' না হয়ে 'আল্লাহ্ সম্পর্কে' হবে, এবং বাক্যটির অর্থ হবে, 'আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান নাই'। তারা সৃষ্টবস্তুর গুণাবলী স্রষ্টার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি তাবারী এবং বায়দাবী দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করেছেন।"

— আসাদ, গৌরবময় কুর'আনের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা

যে সকল *এওয়াজ* বা বিকৃতি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ঢুকানো হয়েছিল তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো সেই জঘন্য কথা যে আল্লাহ্ একটি পুত্রের জনক। কুর'আন একটি ইহুদি বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছে যে উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র; অনুরূপ ভাবে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যে মাসীহ বা যিশু আল্লাহ্‌র পুত্র।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّـهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّـهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّـهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

"ইহুদিরা বলে উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র, এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা, এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। এরা কোন্ উল্টো পথে যাচ্ছে।"

— সূরা তওবা, ৯:৩০

এসব কথা আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌কের সমান, তথা জঘন্য পাপ, এমন একটি পাপ যা আল্লাহ্ মাফ করবেন না (অর্থাৎ, যদি কেউ তার মৃত্যুর পূর্বে এরকম পাপের জন্য ক্ষমা না চায়, তাহলে)। সূরা কাহাফের শুরুতে শির্‌কের এই বর্ণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নবী (সা:) সর্তক করে দিয়েছেন যে দাজ্জাল তার উম্মতকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে শির্‌কের ফাঁদে ফেলবে। সেই শির্‌ককে চেনা এতই কঠিন হবে "ঠিক যেমন অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিপড়াকে চেনা কঠিন।" — আয়েশা (রা:) দ্বারা বর্ণিত এবং হাকিমের মুসতাদরাকে লিপিবদ্ধ।

দাজ্জালের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হবে প্রতারণা করার ক্ষমতা। অতএব, সে শির্‌ককে এমনভাবে গোপন করবে যে তা চেনা খুব কঠিন হবে। ইতোমধ্যেই দাজ্জালের শির্‌ক সারা বিশ্বে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আল্লাহ্‌র সঠিক পথে পরিচালিত বান্দারা বাদে সমগ্র মানবজাতি সেই শির্‌কের ফাঁদে আটকে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা শির্‌ক করে যারা এমন একটি রাষ্ট্রে ভোট দেয় যার সংবিধানে (আমার নিজ দেশ ত্রিনিদাদসহ) বলা আছে: এই সংবিধান এই দেশের সর্বোচ্চ আইন, এতএব এর পরিপন্থি যে কোন আইন (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আইনসহ) সেই পরিমাণে বাতিল বলে গণ্য হবে যে পরিমাণে সেটা এর পরিপন্থি।

এই আয়াত থেকে আরেকটি বিস্ময়কর অর্থ পাওয়া যায়: "আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা" যেমন, তার একটি পুত্র আছে। এখানেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এমনি ভাবে দাজ্জাল অসন্দিহান মানবতাকে বড় বড় মিথ্যার ফাঁদে ফেলবে। যেমন, তার সহকর্মীরা শুনাবে যে, "ইরাকের কাছে সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার হাতিয়ার রয়েছে", বা "ইরান একটি পারমাণবিক হুমকি", বা "আরব ও মুসলিমরা আমেরিকার উপরে ৯/১১-র আক্রমণের জন্য দায়ী", বা পরবর্তীতে "লন্ডন আক্রমণের জন্য দায়ী"। কুর'আনে বলা আছে: "তারা আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের সঙ্গে প্রতারণা করে, প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কারো সঙ্গে

প্রতারণা করে না, অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না" (সূরা বাকারাহ, ২:৯)। অবশেষে তাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে তারাই মিথ্যাবাদী। এ যুগের মুসলমানদের অবশ্যই নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর সতর্কবাণী স্মরণ রাখতে হবে। তিনি বলেছেন: "সাবধান! শেষ যুগে বড় বড় মিথ্যাবাদী দেখা দিবে।" তাই এখানে হুঁশিয়ার করে দিতে হয় যে, দাজ্জাল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মিথ্যার সবচেয়ে বড় যে জাল বুনবে, তার উদ্দেশ্য হবে ইউরো-ইহুদি ইসরাঈল রাষ্ট্রকে পৃথিবীর নিয়ন্তা রাষ্ট্রে পরিণত করা।

ষষ্ঠ আয়াত

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

"তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে সম্ভবতঃ আপনি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।"

"এই বাগ্মীতাপূর্ণ কথাটি নবী (সা:)-এর উদ্দেশ্যে বলা হয় যিনি গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন যখন পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা তাঁর বাণী শুনে তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি তাদের আধ্যাত্মিক অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে খুবই শঙ্কিত ছিলেন। সাধারণ ভাবে তারাও সমাজের কাছ থেকে সীমাহীন অনীহার সম্মুখীন হন যারা ঐশী জ্ঞানের ভিত্তিতে 'সত্য'-কে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।"

— আসাদ, গৌরবময় কুর'আনের ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ

আধ্যাত্মিক অর্থে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম: যাদের কাছে সত্য এসেছে আর তারা সেটাকে গ্রহণ করেছে এবং তার উপর আমল করেছে। তারা হলো বিশ্বাসী এবং তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের পুরস্কার। দ্বিতীয়: যাদের কাছে সত্য এসেছে কিন্তু তারা সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং অস্বীকার করতে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে সিল-মোহর লাগিয়ে দিলেন। কোন ধরনের ধর্মপ্রচার তাদের মন জয় করতে পারবে না। তারা হলো অবিশ্বাসী (কাফির)। জান্নাত তাদের জন্য হারাম। তৃতীয়: যাদের কাছে হয় সত্য এসে পৌঁছায়নি, অথবা তারা সেটাকে মেনেও নেয় নি আবার প্রত্যাখ্যানও করেনি, অথবা গ্রহণ করেছে কিন্তু তার উপর আমল করেনি, ইত্যাদি। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছার বলে শাস্তিও দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

এই আয়াতে সুমহান আল্লাহ্ নবী (সা:)-কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, এমনও লোক রয়েছে যাদের অন্তরে মোহর মারা হয়ে গেছে এবং কোন প্রকার ধর্ম প্রচারনা তাদেরকে সত্যের দিকে আনতে পারবে না। কথাটি বিশ্বাসীদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা দাজ্জালের যুগে বহু মানুষকে জাহান্নামের দিকে যেতে দেখবে। কোন প্রকার ধর্মপ্রচার অবিশ্বাসীদের মন থেকে ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাবকে দূর করতে পারবে না। সূরা কাহাফ কথাটি মহানবী (সা:)-কে উদ্দেশ্য করে বললেও এর মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে এই উপদেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইসলাম বিরোধীদের ব্যাপারে অধিক চিন্তা না করে।

তাদের উচিত হবে নিজেদের বিশ্বাস রক্ষায় মনোযোগ দেয়া। এবিষয়ে সূরা কাহাফে বলা হয়েছে:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

"আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে (*অর্থাৎ, সৎ লোকদের থেকে*) নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেননা। (*অপর দিকে*) যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে আপনি তার আনুগত্য করবেন না।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:২৮

যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সংখ্যা শেষ যুগে বাড়তেই থাকবে, এবং তারা স্বেচ্ছায় ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে, অথবা তাদেরকে একাজে প্ররোচিত করা হবে। এরকম বৈরী পরিবেশে বসবাস করা কতটুকু বিপজ্জনক তা মুসলমানদের বুঝতে পারা উচিত। তারা যেন শয়তানের কারখানায় উচ্চ বেতনের চাকরীর তুলনায় নিজের এবং নিজ পরিবারের নিরাপত্তা ও ঈমানের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়। যুলকার্‌নাইনের উদাহরণ অনুসরণ করে তারা যেন ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বশাসন থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী করে। সেই (অদৃশ্য) দেয়ালটি দূরবর্তী গ্রাম্য এলাকায় অবস্থিত মুসলিম জনপদে তৈরী করাই শ্রেয়।

সপ্তম আয়াত

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

"আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।"

আসাদ মন্তব্য করেছেন: "আমরা পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সেগুলিকে এর শোভা বাড়াবার জন্য তৈরী করেছি, যেন মানুষকে এদিয়ে পরীক্ষা করতে পারি।" আল্লাহ্ মানুষকে সেই সুযোগ দেন যা ব্যবহার করে সে পার্থিব সম্পদের ক্ষেত্রে নিজের আসল নৈতিক চরিত্র প্রকাশ করে। আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আল্লাহ্‌র বাণী অস্বীকার করার মূল কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক এবং অন্ধ আসক্তি। তারই সাথে যোগ হয় তথাকথিত সফল জীবনের মিথ্যা গর্ব।

— আসাদ, গৌরবময় কুর'আনের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা

এই আয়াতে সূরা কাহাফ বিশ্বাসীগণকে সর্তক করে দিচ্ছে যে দাজ্জাল ধনসম্পদ লোভের একটি চতুর ফাঁদ পেতে রাখবে। যখন মানুষের মন সম্পদের প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত লালায়িত হয়ে উঠবে তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, বা তার নির্দেশের দিকে সচেতন থাকা কঠিন হয়ে যাবে। দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবীর উপরে বাস করেই অনবরত আল্লাহ্-তা'আলার জিকিরে মশগুল থাকবে হবে। আমরা যার এবাদত করি তার স্থান তো আমাদের মনের ভেতরে হবার কথা, অর্থাৎ কেবলমাত্র বাহ্যিক শব্দ উচ্চারণ করে সেই স্থান পূরণ হবার নয়। অতএব, যদি কারো মনে দুনিয়া স্থান করে নেয় তাহলে সেই ব্যক্তি দুনিয়ার পূজারী নয় কি!

দাজ্জাল শুধু যে সম্পদের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের ঈমান নষ্ট করে তাই নয়, সে তাদেরকে আস্তে আস্তে এই বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় যে বস্তু জগতের বাইরে আর কোন সত্যতা নেই। চিন্তাধারার এই প্রক্রিয়া শেষ হয় নাস্তিকতায়। আমরা দেখছি, আজ ব্রিটেনে সেই সকল নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে যারা এবিষয়ে কোন লুকোচুরি করে না। দাজ্জালের চমক লাগানো সাফল্যের এটা একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অষ্টম আয়াত

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

"এবং ওর উপর যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করবো।"

ঠিক যেমন পানি সকল জীবনের উৎস, তেমনি পানির অভাব সকল জীবনের ধ্বংসের কারণ হবে। দাজ্জালের প্রতারণা এমনই হবে যে, মানুষ নিজেই নিজের ধ্বংসের স্থপতি হবে, কারণ পানির অপচয় এবং বেপরোয়া খরচ পানিসম্পদকে শেষ করে দিবে।

পানির গুরুত্ব এবং শেষ যুগে পানির ভূমিকা ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এবিষয়ে সূরা কাহাফের অনেক কিছু বলার আছে। বিষয়টি ইনশাআল্লাহ্ সূরা কাহাফের উপর লিখিত চতুর্থ খন্ডে আলোচনা করা হবে (অর্থাৎ, *কুর'আন এবং হাদীসে ইয়াজুজ ও মাজুজ* নামক গ্রন্থে)।

অবশেষে পৃথিবী একটি ধুলার পাত্রে পরিণত হবে। সূরা কাহাফ বার বার পানির বিষয়টির দিকে ফিরে যায়। উদাহরণ স্বরূপ:

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। এটা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর এর সংমিশ্রনে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতাপাতা নির্গত হয়;

অতঃপর তা শুকিয়ে এমন ভাবে গুঁড়া হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ এসবকিছুর উপর শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, তবে তোমার প্রতিপালকের নিকট সৎকর্মের ফল হবে স্থায়ী, এবং এই আশ্বাসের মধ্যেই রয়েছে প্রতিদানের সকল আশা।"

— সূরা কাহাফ, ১৮:৪৫-৪৬

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী অত্যন্ত সুন্দরভাবে সূরা কাহাফের এই দু'টি আয়াতের উপর নিম্মোক্ত মন্তব্য করেছেন:

"বৃষ্টির পানি একটি ভাল জিনিস, কিন্তু এটি স্থায়ী হয় না এবং তুমি এর উপরে কোন মজবুত ভিত্তি স্থাপন করতে পার না। মাটি এটাকে খুব তাড়াতাড়ি শুষে নেয়, এবং নানা ধরনের উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে - তবে কিছু সময়ের জন্য। শীঘ্রই সেগুলি শুকিয়ে যায় এবং খড়কুটা হয়ে যায়, যা সামান্য বাতাস পেলেই মূল্যহীন পদার্থের মত এদিক ওদিক উড়ে যায়। পানিও চলে গেল, তারই সাথে চলে গেল সেই সবুজ সমারোহ। এই হলো দুনিয়ার জীবন। এর তুলনায় রয়েছে অন্তরে অবস্থিত আসল জীবন, যার নজর থাকে পরকালের দিকে। একমাত্র আল্লাহ্ই চিরবিদ্যমান, সর্বমহান। অন্য সবই আসে আর যায়! তবে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সৎকর্মের স্থায়ী মূল্য রয়েছে। সেটাই পুরস্কার হিসেবে সবচেয়ে ভাল, দুইভাবে!

১। সেগুলি আল্লাহ্র দয়ায় আমাদের কাছ থেকে প্রবাহিত হয়, এবং নিজেই আমাদের ঈমানের পুরস্কার;

২। পরকালে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক পুরস্কারের জন্য সেগুলিই আমাদের আশার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।"

— আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী,পবিত্র কুর'আন, মূল বই, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা
সূরা কাহাফের ৪৫ এবং ৪৬ নং আয়াত ও নোট নং ২৩৮৬- ২৩৮৭

নবম এবং দশম আয়াত

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾
إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

"(*যেহেতু এই জীবন একটি পরীক্ষা*) আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও *রাকীমের* (*ধর্মগ্রন্থ, যা তারা হয়ত সাথে নিয়ে গিয়েছিল*) যুবকেরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? যখন যুবকেরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলো, তখন তারা বলেছিল: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।"

সূরা কাহাফ এখানে গুহার তরুন যুবকদের গল্পের অবতারণা করেছে, যা আমরা এই বইয়ের একটি আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তবে, সূরাটির প্রথম দশ আয়াতের মধ্যে গুহার গল্পটি টেনে আনার অর্থ হলো এই যে, গল্পটি দাজ্জালের সাথে সম্পর্কিত।

যদি বিসমিল্লাহকে এই সূরাটির প্রথম আয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলেও গুহার যুবকদের গল্পটি শুরু হচ্ছে প্রথম দশটি আয়াতের মধ্যেই।

সেই কারণে গুহার যুবকদের কাহিনীটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের নজরে দেখতে হবে, এবং দাজ্জালের ফেৎনার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে সেই হেদায়েত এখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে।

১০ § সূরা কাহাফ: শেষ পর্ব

মহানবী (সা:) উপদেশ দিয়েছেন যে দাজ্জাল সামনে আসলে সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত পড়লে তার ফেৎনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। যেহেতু সূরা কাহাফের প্রথম অংশ এতই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের দেখতে হবে এর শেষ অংশে আরও কিছু হেদায়েত আছে কিনা।

এই সূরার শেষ আয়াতগুলি এখানে দেয়া হলো।

আয়াত-১০০

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

"সেদিন (*অর্থাৎ, বিশ্বায়ন, অভূতপূর্ব কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ, নির্বিচারে হত্যাকান্ড, আত্মহত্যা, ইত্যাদির শেষে*) আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব।"

যুলকার্‌নাইন ছিলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি দেয়াল নির্মাণ করে ইয়াজুজ-মাজুজকে সফলভাবে নিভৃত করতে পেরেছিলেন, এবং জনগণকে ইয়াজুজ-মাজুজের ফাসাদ (বিকৃতি, ধ্বংসযজ্ঞ) থেকে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি সর্তক করে বলেছিলেন যে, সুমহান আল্লাহ্ একদিন দেয়ালটি ধ্বসিয়ে দিবেন, এবং সেই ঘটনা ঘটবে শেষ যুগে। তখন কিয়ামতের দশটি আলামত পৃথিবীতে উম্মোচিত হবে, এবং সেই দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্তি একটি।

যখন ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্তি পাবে তখন পৃথিবীর অবস্থা কি হবে সেটা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, অর্থাৎ সেটা হবে যুলকার্‌নাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। যে ক্ষমতার উৎস ধর্মহীনতা, সেই ক্ষমতা মানুষের উপর নিপীড়ন চালাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে তাদের উপর যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং যাদের আচরণ ন্যায়সংগত। এধরনের বিশ্বব্যবস্থা ঐশ্বরিক ব্যবস্থাপনার সাথে সংগতি নয়, বরং সংঘাত সৃষ্টি করে। কুর'আন আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ শান্তিময় এবং প্রীতিকর হিসেবে বর্ণনা করেছে।

অপরদিকে শেষযুগে ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থা হবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ, "একটা ঢেউ আরেকটা ঢেউয়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ার সাদৃশ্য"। সেই সময় শিঙ্গা বেজে উঠবে (যা শুধু যারা ঊর্ধ্ব জগতে রয়েছে তারাই শুনতে পাবে)। সেই ক্ষণ থেকে শুরু হয়ে যাবে শেষ যুগ, যা সমস্ত মানবজাতিকে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বসমাজে পরিণত করবে। সেই বিশ্বসমাজে মোটামুটি সবাই হবে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিচ্ছবি, যারা সবাই দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, আজকের মানুষ এই পরিবর্তনের নাম দিয়েছে 'বিশ্বায়ন'! সূরা কাহাফ জানিয়ে

দিয়েছে যে এই বিশ্বসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে 'কুফর' এবং সংঘর্ষ, এখানে নৈরাজ্য আর বিশৃঙ্খলার ছড়াছড়ি হবে, যা দেখে মনে হবে পৃথিবীর বুকেই জাহান্নামকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জনকে তাদের অশ্লীল জীবন ধারায় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্যিকার বান্দা সেটাকে মানবে না। তারা সেই গুহার যুবকদের মত তাদের ঈমানকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীকে ত্যাগ করবে।

বিশ্বাসীগণের উচিত হবে আধুনিক শহরগুলি পরিত্যাগ করে প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে চলে যাওয়া, যেন তাদেরকে স্ত্রী-সন্তানসহ পৃথিবীর উপর বিছানো নরক দেখতে না হয়।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾

"সাবধান! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান (*অন্তর্নিহিত স্বজ্ঞাত আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি*) দ্বারা অবহিত হতে (তবে এমন কাজ করতে না)। তোমরা অবশ্যই (দিব্য প্রত্যয়ে) জাহান্নাম দেখবে (*যা তখন অবিশ্বাসীদের সামনে মেলে ধরা হবে*)।"

— সূরা তাকাসূর, ১০২:৫-৬

আয়াত ১০১

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

"যাদের (*অর্থাৎ যারা বৃহৎ সমাজের অংশ হিসেবে তাদের মত জীবন যাপন করে; যাদেরকে জাহান্নামে নেয়া হবে*) চোখের মধ্যে আমার যিকির থেকে আবরণ পড়ে গিয়েছিল আর যারা (*সত্যের বাণী*) শুনতেও অপারগ ছিল।"

এই আয়াতটি জাহান্নামের সাথে সম্পর্কিত, যা "আমরা অবিশ্বাসীদের সামনে বিছিয়ে দিয়েছি"। আয়াতটি সর্তক করে দেয় যে, জাহান্নাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে যাদের *চোখ* আছে কিন্তু *দেখতে* পায় না, *কান* আছে কিন্তু *শুনতে* পায় না, *অন্তর* আছে কিন্তু *বুঝতে* পারে না। একথার তাৎপর্য এই যে, যখন দাজ্জাল মানুষের চেহারায় সামনে আসবে, তখন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবে অলোকিত ব্যক্তিরাই তাকে চিনতে পারবে; এবং শুধুমাত্র তারাই ইয়াজুজ-মাজুজকে চিনতে পারবে। জাতিগত ভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ আসলে ইউরোপীয়, এবং মধ্য ইউরোপের খাজার উপজাতি হতে এদের উৎপত্তি, এরা মহানবী (সা:)-এর কিছুদিন পরেই ইহুদি ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। শুধুমাত্র অলোকিত ব্যক্তিরাই সেই গুরুত্বপূর্ণ স্বর্গীয় ভাবে পরিচালিত নাটকটি বুঝতে পারবে, যখন এই সকল শয়তানী শক্তি (অর্থাৎ, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ) বনী ইসরাঈলকে প্রতারিত ক'রে পবিত্রভূমিতে তাদের রাজত্ব স্থাপন করার মিথ্যা আশা পূরণ করার জন্য ফিরিয়ে আনবে।

যারা আধ্যাত্মিক আলোয় অলোকিত নয়, তারা হবে দাজ্জালের জ্ঞানতাত্ত্বিক আক্রমণের শিকার, অর্থাৎ, দাজ্জাল তাদের 'দেখার', 'শোনার' ও 'বুঝার' ক্ষমতা হরণ করে নিবে, এবং তারা জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাবে।

কথাটি এই বইয়ের অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে এক বিশাল অংশ 'বাইরের রূপ' দেখে প্রতারিত হবে, এবং ভেতরের বাস্তবতাকে ভেদ করতে অক্ষম হবে। মহানবী (সা:) এই জ্ঞানতাত্ত্বিক আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, দাজ্জাল এক চোখ দিয়ে দেখে, তার বাম চোখ দিয়ে, কারণ সে তার ডান চোখে অন্ধ। আমরা এই হাদীস থেকে যা বুঝি তা হলো যে, দাজ্জাল অন্তর থেকে অন্ধ এবং তার লক্ষ্য হবে মানবজাতিকেও ভেতর থেকে অন্ধ করে রাখা।

দাজ্জালের এই মহা ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঈমানদারদের উচিৎ হবে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা:

"*আল্লাহুম্মা আরেনি আল-আশইয়া'আ কামা হিয়া* — ও আল্লাহ্ আমাকে প্রত্যেকটা জিনিস আসলে যেরকম, সেই রকম দেখাও (যাতে আমি তার বাহিরটা দেখে প্রতারিত না হই)!"

আয়াত ১০২

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

"কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি।"

যদি আমাদের নেতারা এটা বুঝতে না পারে যে, আমরা এখন সেই যুগে এসে গেছি যখন দাজ্জালের জেরুযালেম থেকে (অর্থাৎ, ভণ্ড রাষ্ট্র ইসরাঈল থেকে) বিশ্বকে শাসন করার পরিকল্পনা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তাহলে তারা কিভাবে উম্মতের রাখাল বা পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারবে? এই অবস্থায় দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া ঠিক এই ধরনের লোকেরাই সারা বিশ্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা বাহ্যিক ভাবে মহানবী (সা:)-এর সুন্নত পালন করে, কিন্তু দাজ্জাল যে ফাঁদ পেতে রেখেছে সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। তাদের ভাগ্যে রয়েছে ভেতরের অন্ধত্ব, কারণ তারা বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ্ তার বান্দাদের অন্তরকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে পারেন। এই অন্ধত্ব তাদের উপর শাস্তি হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কারণ তারা নির্বোধের মত মুসতানাদ সুফী শায়খদের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল অথবা বিরোধে লিপ্ত রয়েছে।

কিছু কিছু মুসলিম নেতা ইসলামের শত্রুদের সাথে নির্লজ্জ ভাবে আঁতাত গড়ে তুলেছে। তারা ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে প্রকাশ্য অথবা গোপন সহায়তার মাধ্যমে অথবা টাকাপয়সার লেনদেনের মাধ্যমে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের মুসলমান সমাজ সেই

ভেড়ার পালের মত যার রাখাল নেকড়ের সাথে সখ্যতা করে, নেকড়েরাই যাদের দেখাশোনা করে, নেকড়েরাই যাদের বেতন দেয়। ত্রিনিদাদ এবং টোবেগোতে আমার নিজস্ব মুসলিম সমাজও এর অন্তর্ভুক্ত।

ইয়াজুজ-মাজুজের বিশ্বব্যবস্থা চালু করে গোটা পৃথিবীকে তাদের শাসনের আওতায় আনার জন্য ইউরো-খ্রিষ্টান ও ইউরো-ইহুদিদের মৈত্রী গড়ে তোলা হয়েছিল। কুর'আন বিশেষভাবে বারণ করেছে যেন মুসলমানেরা সেই মৈত্রীর সাথে বন্ধুত্ব না করে। আরও বলেছে, যারাই সেই মৈত্রীর সদস্য হবে তারা ইয়াজুজ-মাজুজের অন্তর্গত হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (দেখুন কুর'আন, সূরা মায়েদা, ৫:৫১)।

সূরা কাহাফ এই জোরালো ঘোষণা দিয়ে শেষ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র খাস বান্দারা সব সময় কাফেরদের বিরোধিতা করবে, এবং কখনই ধর্মহীন সমাজে যোগদান করবে না। ঠিক তেমনি তারা সেই ইউরোপীয় খ্রিষ্টান-ইহুদি মৈত্রীর সাথে কখনই সখ্যতা করবে না যারা আজ পৃথিবীর উপর শাসন করছে। দরকার পড়লে এই স্রষ্টাবিমুখ সমাজের সাথে বন্ধুত্ব না করে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত থাকার উদ্দেশ্যে দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে।

আয়াত ১০৩ ও ১০৪

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেবো যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেই লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।"

একচোখা আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা এবং তাদের 'অশ্বেতবর্ণ গৃহদাসেরা' পৃথিবীজুড়ে যে সকল দাবী করে, সেগুলি সারপদার্থহীন ও ভুয়া। তারা সবাইকে বিশ্বাস করাতে চায় যে আজকের পৃথিবী অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করছে, এবং এর সাফল্য ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে, তাই এটাই সর্বোত্তম, এটাই কাম্য হওয়া উচিত। তাদের যুক্তি হলো, আজকের এই সাফল্যের জন্য পশ্চিমা সভ্যতা দায়ী, এদের বদৌলতে ইসলামসহ সকল পূর্ববর্তী সভ্যতা বাতিল হয়ে গেছে। তাই তারা মনে করে, আধুনিক মানুষের উচিত সেকেলে সকল জীবনধারা পরিত্যাগ করা, এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আধুনিক ইহুদি-খ্রিষ্টান জীবনধারাকে আলিঙ্গন করা এবং অনুসরণ করা।

আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ইত্যাদিকে দুনিয়ার স্বর্গ হিসেবে দেখানো হয়। যাদের ভেতরের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, তাদের একমাত্র স্বপ্ন এসকল দুনিয়ার-উপর-স্বর্গের পাসপোর্ট অর্জন করা। কিন্তু এই তাক-লাগানো স্বর্গ যে

জাহান্নামের পথ সুগম করে দিচ্ছে, তাদের সেই চেতনাও নেই। বলা বাহুল্য, দুনিয়ার মোহে অন্ধ, মুসলমান 'গৃহদাসেরা' মুসলিম-গ্রাম গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। তাদের জেদ যে মুসলমানদের অবশ্যই মূল সমাজের ভেতরেই বাস করা উচিত, যদিও সেই সমাজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের দিকে ধেয়ে চলেছে।

আয়াত ১০৫

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

"ওরাই তারা, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (*বাদশা হোক আর ফকীর*) কোন (আলাদা) মানদন্ড স্থির করব না (অর্থাৎ, তাদের কোন প্রকার গুরুত্ব ও মূল্য থাকবে না)।"

সুমহান আল্লাহ্-তা'আলা একটি কঠিন সতর্কবাণীর মাধ্যমে সূরা কাহাফের বক্তব্য শেষ করেছেন। যারা সত্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে শেষ বিচারের দিন কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। সেদিন মানুষের আমলের ওজন করা হবে। যাদের সৎ কাজের পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। অন্যদিকে যাদের অসৎ কাজের পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

আয়াত ১০৬

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

"জাহান্নামই তাদের প্রতিফল; কারণ তারা কুফ্‌র করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে।"

কিয়ামতের পূর্বে ন্যায়পরায়ণ ঈমানদারদেরকে ঠাট্টা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হবে। তবে তাদের জন্য রয়েছে ঐশ্বরিক আশ্বাস যে তাদের অত্যাচারীদেরকে নিশ্চয় জাহান্নামের আগুনে ফেলা হবে। এই সতর্কবাণীর সাথে সূরা কাহাফ শুরু হয়েছিল, আর এই বাণী দিয়েই সেটা শেষ হয়েছে।

আয়াত-১০৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

"যারা বিশ্বাস করে (*অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, তাকে সত্যিকার অর্থে ভয় করে, সেকারণে তিনি যাদেরকে পছন্দ করেন না, তারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, আর তাদেরকে ভালবাসে যাদেরকে তিনি ভালবাসেন*) ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে 'জান্নাতুল ফিরদাউস'।"

আর এমনি ভাবেই সূরা কাহাফ বিশ্বাসীদের ন্যায়পরায়ণ আচরণের জন্য সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। যেহেতু তাদেরকে অত্যাচার ও নির্যাতনের কঠিন ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে, সেহেতু তাদের পুরস্কারও হবে অত্যন্ত উঁচু মানের, অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস।

আয়াত-১০৮

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

"সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এটা ছেড়ে তারা অন্য স্থানে যেতে চাইবে না।"

তাদের পুরস্কার শুধু যে স্থায়ী হবে তাই নয়, তাতে তারা সম্পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট হবে, এবং সেই অবস্থার কোন পরিবর্তন কামনা করবে না।

আয়াত-১০৯

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

"বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, একাজে সাহায্যের জন্যে আরও সমুদ্র (কালি) তার সাথে যোগ করলেও।"

মানুষ মারাত্মক ভাবে ভুল করে যখন তারা কুর'আন এবং মহানবী (সা:)-কে প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে নিয়ে মস্করা করে, এবং তাদের উপদেশকে অবহেলা করে। মানুষ একমাত্র কুর'আন ও মুহাম্মদ (সা:)-এর বাণীর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র পাঠানো জ্ঞান সরাসরি পেতে পারে। বহির্জগতের জ্ঞানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেই জগতও আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। তবে যে জ্ঞান আল্লাহ্ তার বান্দাদের অন্তরে পাঠিয়ে দেন, সেটা আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই জ্ঞানের কোন শেষ নেই।

আয়াত ১১০

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) একজনই। অতএব যে তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে, আর তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।"

যারা বলে যে আল্লাহ্-তা'আলা 'একটি ছেলে জন্ম দিয়েছেন', তাদের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী দিয়ে এই সূরাটি শুরু হয়েছিল। এধরণের কথাকে কুর'আন *কাবুরাত কালিমাতান* (জঘন্য কথা) এবং *কাজিবা* (প্রচন্ড মিথ্যা) হিসেবে বর্ণনা করেছে। সেই শির্কের বিষয় নিয়েই সূরাটির শেষ আলোচনা। তবে এই আশ্বাসের সাথে যে, নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর শিক্ষা কখনই বিকৃত হবে না।

শেষ নবী (সা:) যে বাণী নিয়ে এসেছেন তার মোদ্দাকথা হলো: "তোমার উপাস্য কেবল একজন"। যারা এমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থায় ফিরে যেতে চায় যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করবে, এই সূরার শেষ কথা তাদেরকে দু'টি জিনিসের প্রতি আহ্বান করেছে। প্রথমত: তাদের আচরণ হতে হবে ন্যায়পরায়ণ, এবং দ্বিতীয়ত: সব ধরনের শির্ক থেকে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

পরিশিষ্ট

জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিতে ইসলামে স্বপ্নের গুরুত্বঃ

কুর'আন আমাদের অবহিত করে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেন তাদের 'অন্তরে' এবং 'কানে' মোহর মেরে দিয়ে, এবং তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়ে (সূরা বাকারা, ২:৭)। ফলে তাদের অন্তর মরে যায় এবং তারা শুধু বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে পায়। তারা কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ আর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। তারা অন্তরর্দৃষ্টি আর আধ্যাত্মিক উপায়ে (যার মধ্যে রয়েছে নবীদের দৈববাণী এবং সত্য স্বপ্ন) জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম।

স্বপ্ন এবং দৈববাণীর সম্পর্ক মানুষের হৃদয়ের সাথে। এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের স্বভাব এবং চরিত্রের গভীর উপলব্ধি অর্জন করা যায়। সত্য স্বপ্ন এবং দৈববাণী আল্লাহ্‌র দেয়া বিশেষ অনুদান। তবে এগুলি পেতে হলে মনকে হতে হবে কলঙ্কমুক্ত, সুস্থ, নিষ্পাপ এবং ধর্মের মর্মবাণীতে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর নির্মল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা আধ্যাত্মিকভাবে সজাগ, তারাই সত্যস্বপ্ন তথা পবিত্র জ্ঞান দ্বারা আশির্বাদপ্রাপ্ত। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের ঘটনার, এমনকি সতর্কবাণীর, ইঙ্গিত পায়। আর যদি সেই সতর্কবাণীকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করে তাহলে সম্ভাব্য দুর্যোগও এড়াতে পারে।

অপর দিকে রয়েছে দুঃস্বপ্ন যা হৃদয়কে আক্রমণ করে, বিপথে নিয়ে যায়, এবং বিকৃত করে। এধরনের স্বপ্ন হৃদয়কে জর্জরিত করে, যন্ত্রণা দেয় ও হতাশাগ্রস্ত করে তোলে।

এছাড়া অন্যান্য স্বপ্ন আছে যেগুলি হৃদয়ের জন্য মহৌষধ, কারণ এগুলি একপ্রকার জানালা হিসেবে কাজ করে যার ভেতর দিয়ে আমরা নিজের মনের অবস্থা দেখতে পাই এবং নিজেকে চিনতে পারি - চিত্রটি আনন্দ দিতে পারে, আবার ভাবিয়েও তুলতে পারে।

আমরা বর্তমানে এমন এক দুনিয়ায় বাস করি যা দুর্নীতি আর ধর্মদ্রোহিতায় পরিপূর্ণ। মুসলমানসহ, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পারেনা। বেশীর ভাগ মানুষ এটাও বুঝে না যে, সে যেটাকে অন্তর্দৃষ্টি মনে করে সেটা সম্পর্কে সে ততক্ষণ নিশ্চিত হতে পারে না যতক্ষণ না সে সত্য স্বপ্ন দেখে। অবশ্যই আজকের পৃথিবীতে অনেক ঈমানদার আছে যারা অন্তর্লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান, এবং এসব ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই।

যে সকল ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ এসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না, তারা এই উম্মতের নতুন প্রজন্ম। তাদের উপর প্রভাব রয়েছে পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার, যেখান থেকে এসেছে

বস্তুবাদী অধিবিদ্যা (metaphysical materialism), সেই সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) আক্রমণ, যার পরিণতিতে 'মানববাদী' (humanism) ধর্মের চলন শুরু হয়ে গেছে। এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত, যা সকল ধরনের অলৌকিক জ্ঞানের প্রতি অস্বস্তি বোধ করে। বলা বাহুল্য, সত্য স্বপ্ন একটি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা যার নিজস্ব বৈধতা রয়েছে।

আধুনিক ধর্মহীন যুগে জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিতে সত্য স্বপ্নের পাঠ্য-বিষয় হিসেবে কোন স্থান নেই। এটি কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এক বিশাল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই বিষয়টিকে বুদ্ধিবৃত্তিক জাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সত্য স্বপ্নকে পশ্চিমা epistemology বা জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কারণ এই জ্ঞানতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল, এবং জ্ঞানের অন্য যে কোন উৎসকে সন্দেহের চোখে দেখে। তাই অতি ধূর্ত এই পশ্চিমা জ্ঞানপদ্ধতি সত্য স্বপ্নের মত ধর্মীয় অভিজ্ঞতারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চায়।

অপর দিকে সত্য স্বপ্নের বিষয়টি মুসলমানদেরকে একটা স্বর্গীয় সুযোগ করে দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করতে পারে, আর তারই সাথে, সৃষ্টি, পৃথিবী এবং মানব জীবনের সকল রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে। তথাপি ডক্টর মুহাম্মদ ইকবালের মত বিরল সুফী সাধক ও চিন্তাবিদ ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে কোন মনসতাত্ত্বিক পন্ডিত সত্য স্বপ্নের বিষয়ে কোন তাত্ত্বিক কাজ করতে পারেননি। কিছু পশ্চিমা প্রশিক্ষিত পন্ডিতেরা যে কাজ করছেন সেগুলি যেহেতু বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই সেগুলি সত্য স্বপ্নের আসল প্রকৃতি বুঝতে ও বুঝাতে অক্ষম।

আমরা প্রশ্ন করতে চাই, পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বকে গুঁড়িয়ে দেবার এই সুযোগকে কেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ এবং বড় বড় সংস্কার আন্দোলনগুলি কাজে লাগালেন না। ইকবাল লক্ষ্য করেছেন যে ইসলামে ধর্মীয় চিন্তাভাবনা গত পাঁচশত বছর ধরে থেমে রয়েছে। (Muhammad Iqbal: Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, Institute of Islamic Culture, 1986, p-6)।

এই বিবৃতি মুসলমানদেরকে তাদের মানসিক অলসতা থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলার কথা। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, মুসলমানদের উপর পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতিতে আজকের বৈজ্ঞানিক, আধুনিক এবং মৌলবাদী ইসলামের জন্ম হয়েছে, যার উৎস পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্ব, এবং যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বৈধ মনে করে না।

এই ইসলাম, যার আধ্যাত্মিক হৃদয় বাদ পড়ে গেছে, ওয়াহাবী আন্দোলনের রূপে সৌদি আরব থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং সুফীবাদের উপর বিরামহীন ও দুর্দান্ত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায়, তারা *অজ্ঞতাবসত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিতে গিয়ে কিছু মূল্যবান জিনিষকেও জলাঞ্জলী* দিয়েছে।

অবশ্যই আমরা স্বীকার করি যে, কালচক্রে সুফীবাদ জ্ঞানের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, এবং ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের মত দিশা হারিয়ে ফেলেছিল। ইকবাল সেটাকে লক্ষ্য করেছিলেন, এবং বজ্রকলম ব্যবহার করে এবিষয়ে লিখে গেছেন। এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

"মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ বা মরমীবাদের কর্মকৌশল যার মাধ্যমে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র ধর্মীয় জীবন সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিল, আজ তা বিকল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে প্রাচ্যের মুসলমান এতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণের বদলে তাকে অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক লেজুড়বৃত্তিতে তৃপ্তি অর্জন করতে শেখানো হয়েছে।"

— Iqbal: Op. Cit. p. 148-149

ইকবালের যোগ্য উত্তরসূরি মাওলানা ডাঃ ফজলুর রহমান আনসারিও সুফীবাদের স্থবিরতাকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি সতর্ক করেছেন যেন *অজ্ঞতাবসত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিতে গিয়ে মূল্যবান জিনিষকেও জলাঞ্জলী* না দেয়া হয়:

"মুসলিম জাতির দুঃখজনক অধঃপতনের সাথে (অবশ্যই কিছু ঐতিহাসিক কারণে, যা ইসলামি ইতিহাসের ছাত্রদের অজানা নেই), তাসাউফের জ্ঞান এবং অনুশীলনের মধ্যেও নানা ভাবে ভাটা পড়তে থাকে। কিছু কিছু মহলে এর নামটিও অন্য খাতে ব্যবহার করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, তাসাউফ বা ধর্মীয় মনোবৃত্তিকে তার ন্যায়সঙ্গত স্থান থেকে যদি সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ইসলামের নিজস্ব কোন স্থান থাকে না। এটাও বলতে হয় যে, অন্যান্য ধর্মের অনুকরণে তাসাউফকে যদি মরমীবাদ মনে করা হয় তাহলে তা হবে সত্যের অপলাপ।

— F. R. Ansari: The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society
World Federation of Islamic Missions, Karachi. vol 1, p-152 fn)

কিছু কিছু পেশাদার সুযোগসন্ধানীরা সুফীবাদকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, এবং তাদের ভ্রান্ত কার্যকলাপ দ্বারা সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক দাসে পরিণত করেছে। তারপর একটা সময় চলে এলো যখন সংস্কারের নামে ইসলামের বিশ্বাস ও আমলের মধ্যে এই সকল "সুফী বিদয়াত" দূর করতে গিয়ে এক পাগলা ঘোড়া দাবড়ে দেয়া হলো। ফলে, অনেকটা অজান্তেই পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্ব ইসলামি চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করেছে। *অজ্ঞতাবসত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিতে গিয়ে কিছু মূল্যবান জিনিষকেও জলাঞ্জলী* দেয়া হয়েছে। ফলে, এক ধর্মনিরপেক্ষ কাটছাঁট করা ইসলামকে ইসলামের পূণর্জাগরণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসছেন বহু ইসলামি পন্ডিত, যাদের কাছে পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্বের আক্রমণের কোন জবাব নাই, কারণ তারা নিজেরাই সেই জ্ঞানতত্ত্বের জালে বন্দী হয়ে রয়েছেন। ধর্মান্ধতা ও খাঁটি সুফীবাদ সম্পর্কে

ভ্রান্ত ধারণা তাদেরকেও আধ্যাত্মিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অতএব তারা সত্য স্বপ্ন বা দৈব-হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু আধুনিক পশ্চিমা বস্তুবাদের আক্রমণের বহু আগে মুসলিম জগতে আরেক ঝড় বয়ে গিয়েছিল, যাকে মুতাযিলা চিন্তাধারা নামে স্মরণ করা হয়। সেই ঘটনা সম্পর্কে ইকবাল বলেছেন:

"মুতাযিলা চিন্তাধারা ধর্মকে কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি মনে করেছিল। তারা সৃষ্টিতত্ত্বের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কোন পথ রাখে নি। তারা ধর্মকে এক যুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থাপনায় পর্যবসিত করেছিল, যা অবশ্যই একটা নেতিবাচক মনোবৃত্তি। তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে - বিজ্ঞান হোক আর ধর্ম - চিন্তার জগতকে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করা যায় না।" (এখানে ইকবাল অন্যান্য বিষয়ের সাথে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, আর সত্য স্বপ্ন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত)।

— Iqbal, op.cit p-4

ডাঃ মুহাম্মদ ইকবাল তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কারণে প্রকৃত সুফীবাদকে চিনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি সুফী জ্ঞানতত্ত্বকে এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হয়েছিলেন, যা মুসলিম বিশ্বসহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সকল আপত্তিকে ধূলিসাৎ করতে পেরেছিল। যদি ডাঃ মুহাম্মদ ইকবাল মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা দেওবন্দে অথবা ভারতের অন্য কোন ইসলামি বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া করতেন, তাহলে তিনি অত বড় মাপের পন্ডিত হতে পারতেন না। বলা বাহুল্য, তাঁর নিজের স্বাভাবিক প্রতিভার কোন ঘাটতি ছিল না, তবে তাঁর সাফল্যের আসল কারণ ছিল এই যে তিনি খাঁটি সুফীবাদ থেকে তাঁর বিশেষ জ্ঞানতত্ত্ব অর্জন করেছিলেন, যা আধুনিকবাদ ইসলাম দিতে পারে নি।

মুসলিম স্পেন থেকে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইউরোপে পৌঁছেছিল, পরবর্তী ইউরোপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তার থেকে অনেক ভিন্ন। ইহুদি-খ্রিষ্টান ইউরোপ ধর্মের এমন এক কাঠামো তৈরী করলো যেখানে শুধু ততটুকুই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতো যতটুকু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা যায়। এর পরিণতিতে ধর্মের অন্তর, অর্থাৎ *গায়েবের* উপর বিশ্বাসের কোন স্থান রইল না। সেই সাথে কুর'আনের মু'জিযাকে অনুধাবন করা, বা অনুভব করা, ধর্মীয় আচরণের অন্তর্গত রইল না।

ইউরোপ এই মৌলিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করলো যে, একমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই আসল জ্ঞান, আর বাকি সবই হলো রূপকথা। সুতরাং আধুনিক ইউরোপ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং সেই বিষয়ে অধ্যয়নের সকল পথ বন্ধ করে দিল। সত্য স্বপ্ন একটি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। অবশ্য আনন্দের সাথে বলতে হয়, উইলিয়াম জেম্‌স তার Varieties of Religious Experience গ্রন্থে সত্য স্বপ্নকে নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

সত্য স্বপ্নেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করার কি উপায় থাকতে পারে? উদাহরণ স্বরূপ, সত্য স্বপ্ন এরকম হতে পারে, যেমন: *গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার প্রতিবেশির বাড়িতে আগুন লেগেছে। আজ সকালে দেখলাম সেটা পুড়ে গেছে।*

সত্য স্বপ্ন সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা হলো এই যে, ঘটনাগুলি পৃথিবীতে ঘটার আগে অদৃশ্য জগতে থাকে। যেমন উপরের উদাহরণের আগুনটি অদৃশ্য জগতে অবস্থিত ছিল। বাস্তব জগতে ঘটে যাবার আগেই ফেরেশতারা সেই তথ্য স্বপ্নের মধ্যে পৌঁছে দিল।

সত্য স্বপ্নের এই অভিজ্ঞতা কখনই বৈজ্ঞানিক তদন্তের বিষয় হতে পারে না, কারণ পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করেছে তাতে বলা হয়েছে, we cannot transcend observable phenomena, অর্থাৎ, দৃষ্টিগ্রাহ্য ঘটনার বাইরে যাওয়া যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ফ্রয়েড (Freud)। তিনি সত্য স্বপ্নগুলিকে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছেন।

পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব এবং সেখান থেকে উৎপন্ন বৈজ্ঞানিক ধর্মের বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়ে ইকবাল তার প্রধান রচনা-কর্ম The Reconstruction of Religious Thought in Islam লেখেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি অধ্যায় হলো: Knowledge and Religious Experience এবং The Philosophical Test of the Revelations of Religious Experience। পরে তিনি আরেকটি অধ্যায় যোগ করলেন: Is Religion Possible?

আধুনিকবাদ ইসলামে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ইকবাল সাহসিকতার সাথে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। তিনি বইটির ভূমিকায় বিষয়টির উত্থাপন করেছেন। যারা তাঁর চিন্তার সাথে পরিচিত নন, অথবা এর আগে তাঁর চিন্তাকে বুঝতে পারেন নি, তাদেরকে এই অতুলনীয় রচনা-কর্মটি পড়ার জন্য উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য আমরা এখানে সেটা তুলে ধরছি:

"কুর'আন একটি বই, যা ধারণার চেয়ে কর্মকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর কারণ হলো বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে সেই প্রক্রিয়া অনুভব করা সম্ভব নয় যার ভিত্তিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের তালিকা গঠিত হয়েছে। তাছাড়া, আধুনিক মানুষ সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে - ইসলামের প্রাথমিক যুগেও যার প্রচলন ছিল - শুধু যে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তাই নয়, সে এসকল বিষয়কে ভ্রম হিসেবে সন্দেহ করে। সুফীদের খাঁটি প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার মহৎ কাজে বিরাট অবদান রেখেছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আধুনিক মানসিকতার অজ্ঞতার কারণে তারা নতুন অনুপ্রেরণা যোগাতে অক্ষম হয়েছে। তারা সেই সকল পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে যেগুলি এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলা হয়েছিল। কুর'আন বলে, 'তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান, একটি মাত্র আত্মার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মত'। কথাটি বুঝতে হলে জীববিদ্যাগত বিশ্লেষণ আমাদেরকে আসল বিষয় থেকে দূরে নিয়ে যাবে, তাই কথাটিকে আত্মস্থ করতে

হবে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে। তবে তার জন্য পরিশীলিত মেধার দরকার। যদি সেটা না থাকে তাহলে, দুঃখজনক হলেও, বিজ্ঞানসম্মত ধর্মীয় জ্ঞানের দাবী স্বাভাবিক মনে হবে।"

— Mohammad Iqbal: Reconstruction of Religious Thought in Islam
Lahore, Institute of Islamic Culture, 1986. p. v

আধুনিক ভাষায় জোরালো ভাবে যদি কেউ সুফী জ্ঞানতত্ত্বের পক্ষ নিয়ে বক্তব্য দিয়ে থাকে, তাহলে তিনি হলেন ইকবাল। দুঃখের বিষয় হলো, ১৯৩৮ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত, সমকালীন মৌলবাদী ইসলামের ধ্বজাধারী পন্ডিতবর্গ, ইকবালের বিখ্যাত রচনা-কর্মের এই তিনটি অধ্যায়ের অর্থটুকুও বুঝতে পারেন নি।

ইকবাল অবশ্য সেটারও অনুমান করেছিলেন। তাই তিনি স্বজ্ঞেয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈধতা সম্পর্কে লিখলেন:

"এটা ধরে নেবার কোন কারণ নেই যে, চিন্তাশক্তি ও স্বজ্ঞা পরস্পর বিরোধী। এদু'টির উৎস একই, এবং এদু'টি একে অন্যের সম্পূরক। চিন্তাশক্তি জগতের বাস্তবকে খন্ড খন্ড ভাবে দেখে, কিন্তু স্বজ্ঞা দেখে সমষ্টিগত ভাবে। একটার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে প্রতি ক্ষণের পরিবর্তনের উপর, অপরটির নজর থাকে যা কিছু চিরন্তন তার উপর। একটা প্রত্যেক খন্ডকে আলাদাভাবে ভোগ করতে চায় আর গভীর ভাবে দেখতে চায়, অন্যটা গোটা বাস্তবকে এককালীন পেতে চায়। একে অপরকে চাঙ্গা রাখার জন্য দুটারই প্রয়োজন রয়েছে। দুটাই গোটা বাস্তবকে দেখতে চায়, কিন্তু নিজ নিজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, যেমন বার্গ্‌সাঁ (Bergson) বলেছেন: Intuition বা স্বজ্ঞা উচ্চমানের মেধা বৈ আর কি হতে পারে।"

— Muhammad Iqbal: Reconstruction of Religious Thought in Islam
Lahore, Institute of Islamic Culture, 1986. p. 2

যাদের মনে এখনো সন্দেহ রয়ে গেছে, তাদের জানা উচিত যে কুর'আন সেই গুরুত্বপূর্ণ কথা দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি রাখা হয়েছে এমন জিনিষের উপর যা সাধারণ ভাবে দেখা যায় না, অর্থাৎ *গায়েবের* উপর (সূরা বাকারাহ, ২:১)। সত্য স্বপ্ন সেই অদৃশ্য জগতেরই অংশ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (সা:)-এর জীবনের সবচেয়ে গভীর অভিজ্ঞতা হলো, স্বপ্ন নয় বরং তাঁর মে'রাজ বা অদৃশ্য পৃথিবীতে রাত্রি-যাত্রা, অর্থাৎ, অদৃশ্য জগতকে সরাসরি অবলোকনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এসম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে:

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾

"অবশ্যই তিনি তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন।"

— সূরা নাজ্‌ম, ৫৩:১৮

যদি ধর্মীয় সত্যকে তার আসল ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয় তাহলে জ্ঞানকে (knowledge) অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে মুক্তি দিতে হবে। সত্যের একমাত্র ভূমিকাই

হলো মানবসমাজে বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের মানদন্ড স্থির করা, যেন শান্তি, সুখ এবং পূর্ণ সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে।

জ্ঞান (knowledge)-কে ধর্মনিরপেক্ষ করার জন্য আমাদেরকে সেই সকল জ্ঞান তুলে ধরতে হবে যা *আল-গায়ব* (অদৃশ্য) থেকে এসেছে, যার উৎস আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। এটা ছাড়া মানব জীবনে পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার আর কোন পথ নেই। অসাধারণ পন্ডিত মরহুম ইসমাঈল ফারূকী এক সন্ত্রাসী আক্রমণে তাঁর প্রাণ হারিয়েছিলেন। (সেই তালিকায় যোগ করতে হয় সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর তরেজো, ইকুয়েডরের জেমি রলডস, চিলির সালভাদোর আইয়েনদে, প্রমুখদের নাম)। তারপর সেই সন্ত্রাসীরা তাদের মনগড়া 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শুরু করে দেয়, এবং তারই সাথে চলতে থাকে জ্ঞানকে ধর্মনিরপেক্ষ করার কাজ। দুভাগ্যক্রমে ইসমাঈল ফারূকী তাঁর চিন্তাধারার নাম দিয়েছিলেন Islamization of Knowledge, যার উদ্দেশ্য ছিল desecularizing knowledge, বা জ্ঞানকে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু যারা সত্যের অভিযানে তাঁর উত্তরাধিকারী তাদের কাছ থেকে এই মূল্যবান রচনা-কর্মকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সত্য স্বপ্নের বিষয়টির উপর একজন পারদর্শী মুসলিম মনস্তত্ত্ববিদের এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে, যিনি জ্ঞানকে desecularize করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন, মুসলিম চিন্তাচেতনার মধ্যে পবিত্রতার প্রাথমিক ভূমিকাকে তুলে ধরবেন, এবং বাহ্যিক জগত ও মানুষের জগতে 'বস্তু' ও 'আত্মার' সম্পর্কের মধ্যে সুসামঞ্জস্যকে পুনর্ব্যক্ত করবেন। আরও প্রয়োজন রয়েছে *সত্য স্বপ্নের অধিবিদ্যা* বিষয়টির উপর ডাঃ মুহাম্মদ ইকবালের মত ইসলামি পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মূল্যবান অবদান উপহার দেয়া।